

সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬



আল-আমীন মিশন

খলতপুর, উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া



রাজ্যে
সপ্তম



৬৯১ (৯৮.৭%)
তানিশা ফকির

মাধ্যমিক ২০২৬-এ সফল পড়ুয়াদের হার্দিক অভিনন্দন

Board	পরীক্ষার্থী	৯৫%	৯০%	৮০%	৭০%	দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত	৬০০ জন (২২%)
WBBSE	ছাত্র-ছাত্রী	২৩১৫	১৪৫	৬৭১	১৬৪২	২১২৪	নিম্ন-মধ্যবিত্ত ৮০০ জন (৩০%)
CBSE	ছাত্র-ছাত্রী	৩৭৯	৪৩	১২২	২৬২	৩৩৫	
TBSE	ছাত্র	১২	০	০	৩	৪	মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ১৩০৬ জন (৪৮%)
	সর্বমোট	২৭০৬	১৮৮	৭৯৩	১৯০৭	২৪৬৩	

12th



686 (98%)
Salman Uddin

13th



685 (97.8%)
Zunairah Ansar

13th



685 (97.8%)
Md Fahim Abdullah

14th



684 (97.7%)
Ifraj Bin

15th



682 (97.4%)
Md Farhan Tajwar

16th



682 (97.4%)
Sk Samiul Kabir

17th



681 (97.2%)
Sumona Gain

17th



681 (97.2%)
Sayed Alif Shawan

17th



681 (97.2%)
Samin Aktar

17th



681 (97.2%)
Nafisa Anjum

17th



681 (97.2%)
Imran Hussien

17th



681 (97.2%)
Fahim Abdullah

17th



681 (97.2%)
Ariyan Molla

16th



679 (97%)
Muskan Ur Rahaman

সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬

সর্বভারতীয় আভার-থ্যাজুয়েট মেডিকেল কোর্সে ভর্তির পরীক্ষার এ-বারও আল-আমীন মিশনের জয়জয়কার।
প্রায় পাঁচশো সফল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম পর্ব্বায়ে মাত্র আঠাশ জনের সংগ্রাম ও সাফল্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিয়ে
এই পুস্তিকটি ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত ও উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে রচিত।

সম্পাদনা

সেলিম মন্সিক শেখ হাফিজুর রহমান

লেখা

একরামুল হক শেখ আসাদুল ইসলাম

গ্রাফিক্স: মহম্মদ গোলাম কিবরীয়া

বর্ণস্থাপন: ফিরোজ খান

আল-আমীন মিশন ট্রাস্টের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক এম নূরুল ইসলাম কর্তৃক প্লট নং ডি জে ৪/৯, অ্যাকশন এরিবা ১, নিউটাউন
কলকাতা ৭০০ ১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং ডায়মন্ড আর্ট প্রেস ৩৭এ বেস্টিংক স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৬৯ থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৭৪৭৯০ ২০০৭৬, ওয়েবসাইট: www.alameenmission.org, ই-মেল: alameenmission@yahoo.com।

সূচিপত্র



মসিউর রহমান	৫	হাসিবাতুননেশা	১৯
মুদাসসিবুল ইসলাম	৬	সেক ওলিউল্লাহ	২০
সাকিল দফাদার	৭	রমিয়া সিদ্দিকা	২১
মাসুম ইকবাল	৮	সেখ তাহমিদ আজাদ	২২
নাওয়াজ মুনতাসির	৯	প্রিয়াঙ্কা খাতুন	২৩
মহমুদুর রহমান	১০	সোহানা পারভিন	২৪
মনসুর আলম	১১	রুকসার খাতুন	২৫
আফজল হোসেন	১২	মইনুল হাসান	২৬
ফারহানা সিদ্দিকা	১৩	আয়েশা জুলেখা খাতুন	২৭
সৈয়দ মুরসলিন রহমান	১৪	আকেয়া আজাদ	২৮
সাইন আক্তার	১৫	আয়েশা সিদ্দিকা	২৯
মহ. মাসেদুল হোসেন গাজী	১৬	মহম্মদ সালমান সেখ	৩০
সেখ আতাউল রহমান	১৭	সেখ খাদেম আলি	৩১
ইমরান আলি	১৮	শেখ নওসিন শারমিলি	৩২



চেতনাই মানুষকে যুগ-যুগান্তর ধরে ধীরে ধীরে আলোর জগতে এনে শ্রেষ্ঠত্বের সিংহাসনে বসিয়েছে। সেই চেতনার ভূমিই হল শিক্ষা— যাকে আবাদ করতে হয় ক্রমাগত। তবু আজও কোথাও কোথাও সেই জমি অনাবাদি হয়ে পড়ে আছে— আল-আমীন মিশন নিজের সব সামর্থ্য নিয়ে মানবজমিন কর্ষণ করে সোনা ফলানোর স্বপ্ন একে দিচ্ছে অসংখ্য মানুষের চোখে। পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র অসহায় পিছিয়ে পড়া একটা অংশের মানুষের কাছে তাই আল-আমীন যেন এক আলোকবর্তিকা। আল-আমীনের প্রতি মানুষের মনের এই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অনুভব করে আমরা এ-কাজে আরও নিষ্ঠা ও নিবিষ্ট থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এর পরেও একটা বিষয় পড়ে থাকে, তা হল— কর্ম এবং অর্থ। এ-দুইয়ের অভাবে কতজনকে আত্মপরিচয়হীন হয়ে হারিয়ে যেতে দেখেছি। শ্বাসবৃদ্ধ প্রতিজ্ঞায় ওই পরাজয়ের কবল থেকে রক্ষা করতে আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে চাই। কিন্তু, আমরাই বা কতটুকু! আল্লাহ সব পরিকল্পনার মালিক। আমরা শুধু তাঁর ইচ্ছের অধীনে নিজেদের স্রম সঞ্চল করে এগিয়ে চলেছি। প্রতিবছরের বিভিন্ন পরীক্ষায় মিশনের পড়ুয়ারা মেধার মূল্যে অভিভূত করার মতো সাফল্য পায়। বিনিময়ে তারা পায় সম্মানজনক পেশা, আলোকিত ভবিষ্যৎ। অতীতের অন্ধকার কটিতে থাকে ধীরে ধীরে। একটা সমাজ মাথা তুলে বাঁচতে শেখে।

এ-বছর নিট (ইউজি) পরীক্ষার মাধ্যমে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তির ছাড়পত্র পাওয়া মিশনের প্রায় ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২৮ জনের কথা এই সংকলনে মুদ্রিত হল। পরের সংকলনে লেখা হবে আরও কয়েক জনের কথা। এ ছাড়াও অন্যান্য পরীক্ষার কৃতীরাও আছে। আল-আমীন মিশন এইসব পড়ুয়ার মণিময় আলোর ভেতরে বর্ণালির অক্ষর দিয়ে রচিত এক নাম।

অন্তরের শুভ আকাঙ্ক্ষা অনুভূতি আর সহৃদয়তা নিয়ে যাঁরা দশকের পর দশক ধরে সজো রয়েছেন, তাঁদের প্রতি রইল আমাদের কৃতজ্ঞতা ও আত্মীয়তার অভিনন্দন।

খলতপুর, হাওড়া
সেপ্টেম্বর ২০২৬

এম নূরুল ইসলাম
প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, আল-আমীন মিশন

মসিউর রহমান

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১৮০৫

এইমস, কল্যাণী

পিতা - মাতা
তাদের সন্তানকে
আল-আমীন
মিশনে ভর্তি করেন
বড়ো আশা নিয়ে।
মাঝার বাঁধন ছিন্ন
করে যে-দিন
প্রাণপিত্র সন্তানকে
মিশনে রেখে যান,
সে-দিন সকলের
অলঙ্কে একটি



স্বপ্নের বীজ বপন করে যান মিশনের উঠোনে। সেই স্বপ্ন তাঁদের
সন্তানদের হাত ধরে মিশনের সহায়তার পূরণ হবে একদিন— বুকের
এক কোণে পড়ে থাকে এমন ভাবনা। আল-আমীন মিশন সেই স্বপ্নকে
অনুকূল পরিবেশ দেয়। জল দেয়। লালন-পালন করে প্রথম মমতায়।

ন্যাশনাল এলিজিবিলাটি কাম এন্ট্রাল টেস্ট বা নিট, দেশের অন্যতম
কঠিন পরীক্ষালির মধ্যে একটি। নিট পরীক্ষার গণ্ডি টপকে ছাড়পত্র
হাতে নিয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেল বাংলার শত শত পরিবারের
অধিকার ঘর আলোয় ভরে ওঠে। এ-বছর এমনই থায় পাঁচ শতাধিক ঘর
আলোকিত হয়েছে মিশনের হাত ধরে।

২০২৬ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় আল-আমীন মিশন থেকে
ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সবার ওপরে আছে
যে-ছেলেটি, তার নাম মসিউর রহমান। ২০২৬ সালে নিট (ইউজি)
পরীক্ষায় মোট ১৯ লক্ষ ৯৯ হাজার ৮৯৫ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ

করেছিল। নিট পরীক্ষানিয়ামক সংস্থান্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ১১ লাখ
২১ হাজার ১৮৫ জনকে সফল হিসেবে ঘোষণা করে। দেশের লক্ষ লক্ষ
পরীক্ষার্থীর মধ্যে আল-আমীন মিশনের মসিউর রহমান ১৮০৫ ব্যাঙ্ক
করেছে। পেয়েছে ৬৪৫ নম্বর। সে নদিয়া জেলার কল্যাণীর অল ইন্ডিয়া
ইনসটিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে।

মসিউর রহমানের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুর থানার
এসারপাড়া গ্রামে। পিতা মহম্মদ মাজেদ আলির পড়াশোনা চতুর্থ শ্রেণি
পর্যন্ত। চাকাস করে সংসার চালান। মা মুর্শিদা বিবিকে খুব অল্পবয়সে
হারালেও দ্বিতীয় মা তাঁকে যথেষ্ট ভালোবাসেন। বাড়িতে আরও দুই দাদা
আছে মসিউরের। বড়োভাই সফিউর ইসলাম বি.এ. পাস। মেজোভাই
মুরসলিম সেখ আইনজীবী হওয়ার লক্ষ্যে ল পড়ছেন। মামার পরামর্শে
মেধাবী মসিউরকে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করা হয়। ক্লাস ফাইভ থেকে
মিশনের ধুলিরান শাখা, অর্থাৎ রহমানিয়া একাডেমিতে পড়েছে সে। ২০২২
সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৯৪.২ শতাংশ নম্বর। এরপর কলকাতার
নিকটস্থ আল-আমীনের বজবজ শাখায় আসে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি
পাঠনপাঠনের জন্যে। ২০২৪ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৯১.৮
শতাংশ নম্বর। এরপর ডাক্তারি পড়ার লক্ষ্যে হাওড়ার খলিশানি শাখায় শুরু
করে নিটের কোর্স নেওয়া। এক বছর কোর্স নেওয়ার পর গতবছর নিট
পরীক্ষায় বসে পায় ৪৮৯ নম্বর। মাত্র দশ-পনেরো নম্বরের জন্যে স্বপ্ন অথবা
থেকে যায়। ভেঙে না পড়ে ভুল-ত্রুটি শুধবে আরও নিবিড় প্রত্নতি শুরুর করে।
সেই পরিশ্রমের ফল এ-বছরের চোখ-বঁধানো সাফল্য।

ভবিষ্যতে নিউরোলজিস্ট হতে চাওয়া মসিউর তার এই সাফল্যের
পেছনে আববা-মা ও মিশনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছে। জনিয়েছে,
“আববা-মা আমার পড়াশোনার জন্যে কেবল খরচ জোগাননি বা
আল-আমীন মিশন আমাকে কেবল কম বেতনে পড়ার সুযোগ করে
দেয়নি। আববা-মা সর্ব-অবস্থায় আমাকে আশা দিয়েছেন, নিরাশ হতে
দেননি। মিশন-কর্তৃপক্ষও ঠিক আববা-মায়ের মতো করে আমার পাশে
দাঁড়িয়েছে।”■

মুদাসসিবুল ইসলাম

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ২১৪৭

এইমস, কল্যাণী

একটা ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার ভালো পরিবেশ একজন শিক্ষার্থীকে সাফল্যে পৌঁছে

দোড়গোড়ার পৌঁছে
দিতে কতটা ভূ
মিকা পালন করে
তা জানতে হলে
মুদাসসিবুলের
কথা পড়তে
হবে। মুদাসসিবুল
মাধ্যমিকে ৯৪.১৪
শতাংশ এবং
উচ্চ-মাধ্যমিকে
৯১.৪ শতাংশ নম্বর



পেয়েছে। এই নম্বরগুলোই বলে দিচ্ছে মুদাসসিবুলের মেধার জোর কতখানি। মেধার ওপর ভরসা করেই একটি সর্বভারতীয় কোচিং সংস্থা থেকে সে এক বছর অনলাইন কোচিং নিয়েছিল। কিন্তু তবী তীরের কাছে এসে ডুবে গেলেও সে নৌকা ভিড়ার আল-আমীন মিশনের ঘাটে। তার ফল কী? নিট পরীক্ষায় ৬৪১ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় ক্রমে তার ব্যাঙ্ক ২১৪৭। এ-বিষয়ে মুদাসসিবুলের কী মত? “আমি বলব নিটের প্রভুতির জন্যে আল-আমীন মিশনই সেবা। অনলাইন প্রভুতিতে খরচা কম হলেও সাফল্য পাওয়া বেশ কঠিন। কারণ সেখানে সর্বক্ষণ নজরদারি করার মতো কেউ নেই। আমাদের চারপাশে ডিসট্রাকশন করার উপকরণ প্রচুর। বিশেষ করে মোবাইল। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন একটা কাজ। এর থেকে পরিব্রাজের জন্যে মিশনের ৬ | সাক্ষ্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬

আবাসিক কোচিংয়ের বিকল্প কিছু নেই। মিশনে প্রচুর পরীক্ষা হয়, বা কনফিডেন্স বিস্তার করতে সাহায্য করে। টাইম মেনে সবটা হয়। একটা নিবিড় ব্যবস্থাপনা। বাইরে এটা পাওয়া যাবে না।”

২০২৬ সালের নিট (ইউজি) পরীক্ষায় উজ্জ্বল সাফল্য পাওয়া মুদাসসিবুল ইসলামের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুশমন্ডি থানার জিয়াপাড়া গ্রামে। বি.এসসি. পাস তার পিতা খাদেমুল ইসলাম সরকারি হাই মাস্টার শ্রমিক। মাধ্যমিক পাস মা জাহবুনা খাতুন গৃহবধু। মুদাসসিবুলের এক দিদি আছে। সাইমা খাতুন। তিনি সাম্মানিক ভূগোল বিষয়ে পাঠ্যবৃত্ত। মুদাসসিবুল মুর্শিদাবাদের দু-টি আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়েছে। ভালো ফল করার পরও আল-আমীন মিশনকেই ডাক্তারি পড়ার স্বপ্নপূরণের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান মনে করে ভর্তি হয়। নিটের কোচিং নিয়েছে আল-আমীন মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাসে থেকে।

নিট পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে সে কীভাবে প্রভুতি নিয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তরে সে জানিয়েছে, “আমার সিলেবাস শেষ করাই ছিল। তাই আমি পরীক্ষার ওপর জোর দিই। মিশনের সব পরীক্ষা ছাড়াও অন্য সংস্থার কোর্সে সন্তুষ্টি করে পরীক্ষা দিয়েছি। কোর্সে চেন ব্যাঙ্ক কিনে সলভ করেছি। জেইই মেইনস থেকে এখন অনেক প্রশ্ন আসছে, তাই ২৪ বছরের কোর্সে চেন সলভ করেছি। জেইই মেইনস পরীক্ষাতেও বসেছিলাম। ২৬ হাজার প্লাস ব্যাঙ্ক এসেছিল।” নিট-পরীক্ষার্থীদের জন্যে মুদাসসিবুলের পরামর্শ— “সিলেবাস তাড়াতাড়ি শেষ করো। টেস্ট দাও যত পারো। কোর্সে চেন প্রাকটিস করো। স্পিড বাড়ো।”

তার এই সাফল্যে আল-আমীন মিশনের যোগদান কতটুকু? প্রশ্ন শেষ করতে না-দিয়েই উত্তর দেয়— “মিশনে না এলে এত ভালো ব্যাঙ্ক হত না। মিশনে আসার পরই ট্যাগেট নির্ধারণ করতে পারি। ভালো ফল করতে পারব, এই কনফিডেন্স তৈরি করে দিয়েছে মিশন।”

মুদাসসিবুল কল্যাণীর আল ইন্ডিয়া ইনসটিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্সে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। ■

সাকিল দফাদার

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৩৪৯৮

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

কিছু কিছু ঘটনা মানুষের জীবনে যে-আনন্দের বন্যা বয়ে আনে তা পরিমাপ করার একক এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। নিট পরীক্ষার পাস করে একটি সাধারণ পরিবারের সন্তান ডাক্তারি পড়ার যোগ্যতা অর্জন করলে কী পরিমাণ আনন্দে ভেসে যায় পরিবারটি তা চোখে না দেখলে আন্দাজ করাও মুশকিল। যদি বিনিঙে,



অর্থাৎ কোনো ইয়ার লস না করে, উচ্চ-মাধ্যমিক দেওয়ার বছরেই সুযোগ পায় তাহলে আনন্দের মাত্রা বহু গুণ বেড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। যদি এরকম হয় যে, বিনিঙেই একটা চোখ ধাঁধানো ব্যাঙ্ক করে ফেলল, তাহলে সেই খুশিকে আমরা মাপব কী দিয়ে! সাকিল দফাদার এ-বারের নিট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় জুয়ে ব্যাঙ্ক করেছে ৩৪৯৮। পেয়েছে ৬৩০ নম্বর। মিশন থেকে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে তার নাম আছে চার নম্বর। এ-বছরই সে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। এই পরীক্ষাতেও দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে। ৯৪.৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে।

কেবল সাকিল দফাদার নয়, আল-আমীন মিশন থেকে প্রতিবছরই বেশ কিছু পড়ুয়া বিনিঙে নিট পরীক্ষা দিয়ে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পায়। এমন মেধাবী পড়ুয়াদের জন্যে আলাদা করে বৃত্তিও নেওয়া হয়। মিশনের

খলতপুর শাখায় বাছাই করা চল্লিশ জন এমন পড়ুয়া নিয়ে টি-৪০ নামে আলাদা থুপ তৈরি করে কেচিঙের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাকিল দফাদারের মতো অনেকেই সফল হচ্ছে।

সাকিলের সাফল্যের ঘটনা বাড়তি খুশি বয়ে আনার পেছনে আরও দু-টি পারিবারিক দিক জড়িয়ে আছে। এক, তার খালা সুমাইয়া খাতুনের অনুষ্ণা। সুমাইয়া আল-আমীন মিশনের প্রাক্তনী। ২০২২ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করেন। ভালো রেজাল্ট করেছিলেন। নিট পরীক্ষা দিয়ে পেয়েছিলেন ৬২৮। কাট-অব-মার্কস ৬৩৩ হওয়ার ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি। বর্তমানে তিনি সরকারি কলেজে বি.এসসি. নর্সিং পড়ছেন। দ্বিতীয় অনুষ্ণা সাকিল দফাদারের পিতা রফিকুল দফাদার। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস রফিকুল সাহেব প্রামাণ্য চিকিৎসক। তাঁরও স্বপ্ন ছেলেকে বড়ো ডাক্তার করার। একটা বহু আকর্ষিত স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সাকিলের হাত ধরে।

সাকিলের বাড়ি নদিয়া জেলার তেহট্ট থানার গোবিন্দপুর গ্রামে। বাবা ছাড়াও পরিবারে আছেন মা সিরিনা খাতুন বিবি ও বোন বুহি দফাদার। সিরিনা খাতুনের পড়াশোনা মাধ্যমিক পর্যন্ত। তিনি আইসিডিএস-কম্বী। বোন বুহি ক্লাস কইন্ডের ছাত্রী।

সাকিলের লেখাপড়ার ভিত্তি অবশ্য তার বাবা-মায়ের হাতে তৈরি হয়নি। তাঁরা পেশাগত ব্যস্ততার দিন কাটান। তাই সাকিল শৈশবের অনেকটা সময় কাটিয়েছে নানির বাড়িতে। নানা-নানির বস্ত্রে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর আল-আমীন মিশনে ভর্তি হয় ক্লাস এইটে। তখন লকডাউন চলছিল। তাই ক্লাস নাইন থেকেই মিশনে থেকে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। পড়ত খলতপুর শাখায়। ২০২৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার সে পেয়েছিল ৯৪.৪ শতাংশ নম্বর। উচ্চ-মাধ্যমিক জুয়ে পড়াশোনাও খলতপুর শাখাতেই। মিশনের পড়াশোনার পরিবেশ, স্যারদের গাইডেন্সকে কাজে লাগিয়েই বাজিমাত করেছে সাকিল। ডাক্তারি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে তার স্টেট ব্যাঙ্ক হয়েছে ৪০। মেডিকেল কলেজ, কলকাতার মতো প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে সে। ■

মাসুম ইকবাল

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪৪০৮

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মালদা জেলার বৈষ্ণবনগর থানার শূকপাড়া গ্রামে বাড়ি আলাউদ্দিন সেখ ও হেনা বিবির।

মুর্শিদাবাদ আর মালদাজুড়ে এখনও বহু নিরক্ষর মানুষের বসবাস। এঁরা তাঁদেরই পতিনিধি। পড়াশোনা না জানলে দিনমজুরি করে জীবন কাটাতে হয়। আলাউদ্দিন সেখ তা করেন। স্ত্রী বাড়ির কাজ



ছাড়া আর কীই-বা করবেন। মুশকিল হল তাঁদের দুঃসাহস—ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা শেখাবেন, মানুষের মতো মানুষ তৈরি করবেন। রাজ্যে দিনমজুরি করে তেমন মজুরি পাওয়া যায় না। কাজও মেলে না সব সময়। তাই ভিনরাজ্যে কাজে যেতেও রাজি। এভাবেই আলাউদ্দিন সেখ হয়ে যান পরিবারীশ্রমিক। আলাউদ্দিন সেখ ও হেনা বিবির দুই ছেলে আর এক মেয়ে। বড়োছেলের নাম মাসুম ইকবাল। পড়াশোনার খুবই ভালো। কোনো ভালো স্কুলে দিতে পারলে অনেক দূর যেতে পারে। কিন্তু আলাউদ্দিন সাহেবের সে-ক্ষমতা কোথায় যে ভালো স্কুলে পড়াবেন ছেলেকে! এমন সময় এক প্রতিবেশী তাঁকে আল-আমীন মিশন নামে এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খোঁজ দেন। দরিদ্র ও মেধাবী পড়ুয়া হলে সেখানে আজকের দিনেও মাসে সর্বনিম্ন ৩৯০

৮ | সাক্ষ্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬

টাকা বেতন দিয়ে পড়া যায়। বৃকে আশার আলো উঁকি দেয়। মাসুমকে নিয়ে পৌঁছেলে মিশন-কর্তৃপক্ষ মাসিক ৯৯০ টাকা বেতনে পড়ার সুযোগ দেয়। উত্তর দিনাজপুরের ঝাড়বাড়ি শাখার পড়াশোনা চালিয়ে যায় মাসুম। পড়তে বসলে বইয়ের পাতার আবখা-মাখের মলিন মুখ ভেসে উঠতে দেখে মাসুম। চোয়াল শক্ত হয়। ক্রমাগত ভালো রেজাল্ট করে চলে মাসুম। ২০২২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পায় ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর। মিশন-কর্তৃপক্ষ এবার তাকে কলকাতার কাছাকাছি বজবজ শাখায় উচ্চ-মাধ্যমিকের পাঠ নেওয়ার সুযোগ দেয়। ২০২৪ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পায় ৮৯ শতাংশ নম্বর। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করার পরই মিশনের স্যারেরা ডাক্তার হওয়ার মতো এক প্রায় অবিশ্বাস্য স্বপ্ন এঁকে দেয় মাসুমের মনে। আলাউদ্দিন সাহেবের বুক কেঁপে ওঠে। দেশের উচ্চবিত্ত অনেক পরিবারও লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে যে-স্বপ্ন সফল করতে বেগ পায়, সেই স্বপ্ন কি তার দেখা শোভা পায়? কথা বলেন নিজের সঙ্গে। মিশন সাহস দেয় ইকবালকে—নিশ্চয় হবে। তাকে নিটের প্রতুতির জন্যে এ-বার খলিশানি শাখার সুযোগ দেওয়া হয়। সাহসে ভর করে পড়াশোনার ডুবে যায় ইকবাল। এক বছরের প্রতুতির পর পরীক্ষায় বসে পায় ৪৯১ নম্বর। মাত্র দশ-পনেরো নম্বরের দূরত্বে থমকে যায় ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন। আবখা-মাখের মুখ তাকে হতাশ হতে দেয় না। মিশনও পাশে থাকে। আবার লড়াই শুরু করে ইকবাল। এবার জীবন তাকে সাক্ষ্যের আলোয় উজ্জ্বল করে তোলে। ২০২৬ সালের নিউ পরীক্ষায় সে পায় ৬২৪ নম্বর। সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪৪০৮। স্টেট ব্যাঙ্ক ৬০। মেডিকেল কলেজ, কলকাতার মতো ঐতিহ্যবাহী মেডিকেল কলেজের করিডোরে অ্যাপোন পরে স্টেথোস্কোপ নিয়ে হেঁটে যায় ইকবাল। উচ্চবিত্ত পরিবারের উজ্জ্বল মুখের সহপাঠীদের ভিড়ে মিশে থাকা ইকবালের মুখ দেখে পড়া যায় না আলাউদ্দিন সেখ আর হেনা বিবির কথা। আল-আমীন মিশনের ভূমিকা দেখা থাকে না পোশাকের রঙে। ইকবাল এসব ধারণা করে অস্তরে। ■

নাওয়াজ মুনতাসির

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪৪১২

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

আল-আমীন মিশনের বিজ্ঞান মূলত পশ্চিমবঙ্গজুড়ে। রাজ্যের বাইরেও মিশনের শাখা আছে।

রাজ্যের বাইরে থেকে পশ্চিমবঙ্গের শাখাগুলিতে ও ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হচ্ছে। এবং চমকপ্রদ ফল করেছে। তেমনই একজন ছাত্রের নাম হল নাওয়াজ মুনতাসির। রানিঙে নিট পরীক্ষায় ভালো ফল করা অত্যন্ত

খুশির ও গর্বের বিষয়। মুনতাসির কেবল রানিঙে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পায়নি, যে-ফল করেছে তা চমকে দেওয়ার মতো। তার সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক হয়েছে ৪৪১২। পেয়েছে ৬২৪ নম্বর। মুনতাসিরের বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সহিবগঞ্জ জেলার রাজমহল থানার বাবুটোলা গ্রামে। ঝাড়খণ্ড রাজ্যে তার স্টেট ব্যাঙ্ক হয়েছে ২০। অবশ্য অল ইন্ডিয়া কেটারিং সে কলকাতাতেই পড়ার জন্যে প্রথম কাউন্সেলিঙে এন আর এস মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেয়েছে।

সময়ের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে আল-আমীন মিশন বেশ কিছু ইংরেজি মাধ্যম শাখা চালু করেছে। ফলে ভাষাগত সমস্যা এড়িয়ে রাজ্যের বাংলাভাষীদের সঙ্গে ভিন্নরাজ্যের অবাঙালি পড়ুয়াদের পড়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।



২০২৬ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায়
৯৩.৮ শতাংশ নম্বর। মিশনের ব্যবস্থাপনায়
সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে আলাদা
নজর রাখা হয় যাতে রানিঙেই নিট পরীক্ষায়
সফল্য লাভ করতে পারে।

মুনতাসির আল-আমীনে ভর্তি হয় ক্লাস সেভেনে। তখন লকডাউন চলছিল। পর্বের বছর থেকে নিয়মিত ক্লাস করে শিলিগুড়ির মিলনমোড় শাখায়। ২০২৪ সালে সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৯৭.৪ শতাংশ নম্বর। এরপর উচ্চ-মাধ্যমিক জীবের পড়াশোনার জন্যে আসে বজবজ শাখায়। ২০২৬ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৯৩.৮ শতাংশ নম্বর। মিশনের ব্যবস্থাপনায় সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীদের দিকে আলাদা নজর রাখা হয় যাতে রানিঙেই নিট পরীক্ষায় সফল্য লাভ করতে পারে। উচ্চ-মাধ্যমিকের পঠন-পাঠন চলে নিট পরীক্ষার দিকে ফোকাস রেখে। সপ্তাহে একদিন নিটের কেচিঙের ব্যবস্থা থাকে। এসবের কারণেই রানিঙে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী সফল হয়।

নিটে চমকপ্রদ ফল করা মুনতাসির আগামীনিট-পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। তার মতে— প্রথমেই ভেবে নিতে হবে রানিঙেই সফল হতে হবে। ফিজিক্স কঠিন লাগে বেশিরভাগ ছেলে-মেয়ের, তাই বেশি পড়তে হবে। ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতিদিন ক্লাস ছাড়াও কমপক্ষে পাঁচ-ছ ঘণ্টা পড়তে হবে। বসন্তা পারা ব্যার মক-টেস্ট দিতে হবে।

মোট চার সদস্যের পরিবার মুনতাসিরদের। পিতা মহম্মাদ মইনুদ্দিন বি.এ. পাস। তিনি ঝাড়খণ্ডের ভূমি দপ্তরে চাকরি করেন। মা মহসিনা বেগমও বি.এ. পাস। তিনি আইসিডিএস-কর্মী। বোন সাহানা জফতিমা এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। আল-আমীন মিশনের হাত ধরে এই পরিবারের উজ্জ্বলতম মুখ হয়ে উঠেছে নাওয়াজ মুনতাসির। ■

মাহমুদুর রহমান

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪৫৪৪

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

আল-আমীন মিশন থেকে একই পরিবারের যেমন একাধিক সন্তানের ডাক্তার হওয়ার অসংখ্য নজির আছে তেমনি একজন ডাক্তার হতে পারেনি কিন্তু অন্য সন্তান হয়েছে এমন নজিরও আছে। এরকমই একটা পরিবারের কথা আপনাদের জনাই।



মুর্শিদাবাদ

জেলায় রঘুনাথগঞ্জ

খানার বামপুত্র থামে বাড়ি বি.এসসি. পাস মহম্মদ খোসবুর রহমানের। পেশায় তিনি প্যারটিচার। তাঁর স্ত্রী মানোয়ারা খাতুন একজন সাধারণ গৃহবধূ। মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়েছেন। এই দম্পতির তিন সন্তান— মাসুদুর রহমান, মাহমুদুর রহমান, মুক্তাফিজুর রহমান। আল-আমীন মিশনের গল্প এখন মুর্শিদাবাদের ঘরে ঘরে। অনেক আশা নিয়ে ২০১৯ সালে মাসুদুরকে ক্লাস নাইনে আল-আমীন মিশনে ভর্তি করা হয়। পড়ত মিশনের মুর্শিদাবাদের মরিচা শাখায়। লকডাউনের ডামাডোলির মাঝে ২০২১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পায় ৯৫ শতাংশ নম্বর। ২০২৩ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার ভাঙড় শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে পায় ৮৫ শতাংশ নম্বর। তারপর নিট কোচিং নেওয়া শুরু করে গোলাবাড়ি শাখায়। শরীর খারাপ হলে তিন মাস পর বাড়ি

১০ | সাক্ষ্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬

চলে যেতে হয়। প্রথম বার নিট পরীক্ষায় সে পায় ৩৫০ নম্বর। পরের বছর তার একটা অপারেশন হয়। পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটে। বাড়ি থেকে অনলাইনে পড়াশোনা চালায়। চলতি বছরের নিট পরীক্ষায় সে সফল হয়নি। আর-এক বার পরীক্ষায় বসবে, না পেলেন অন্য যেসব কোর্সে সুযোগ পাবে ভর্তি হয়ে বাবে। অন্যদিকে পরিবারের আর-এক সন্তানকে ২০২১ সালে ক্লাস এইটে ভর্তি করা হয়। তার নাম মাহমুদুর। মাহমুদুরের গল্পটা একেবারেই আলাদা। তার সাফল্য তারিফ করে বলায় মতো। ২০২৪ সালে বেলডাঙা ক্যাম্পাস থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে সে পায় ৮৯ শতাংশ নম্বর। এরপর কলকাতার পাঁচুড় শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক। ২০২৬ সালে পেয়েছে মাধ্যমিকের মতোই, ৮৯ শতাংশ নম্বর। আর তাক লাগানো বিষয় হল সে কেবল রনিঙে ডাক্তারি পড়ার যোগ্যতা অর্জন করেনি লাখ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে সে নিটে ৬২৩ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক করেছে ৪৫৪৪। মাহমুদুরের ইচ্ছা ছিল কল্যাণী এইমসে পড়ার। সেখানে সুযোগ না হওয়ার ইনসিটিটিউট অব পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ, যাকে আমরা পি জি নামে বেশি চিনি, প্রখ্যাত সেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার ভবিষ্যতের লক্ষ্য কার্ডিওলজিস্ট হওয়া।

ইয়ার লস না করে দ্রুত নিট পরীক্ষায় সাফল্য পেতে হলে কী করা দরকার, এই প্রশ্নের উত্তরে মাহমুদুর জনিয়েছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিলেবাস শেষ করে ফেলতে হবে। তারপর কোন চ্যাপ্টারগুলোর সমস্যা হচ্ছে তা চিহ্নিত করে বার বার পড়তে হবে। আর যতটা পারা যায় মক-টেস্ট দিতে হবে। এতে অভিজ্ঞতা বাড়বে। ভুল কমবে। স্পিড বাড়বে। লক্ষ্যের দিকে বেশি বেশি এগিয়ে বাবে।

মাসুদুর-মাহমুদুরদের মতো ছেলেমেয়েদের আল-আমীন মিশন কেবল পড়াশোনার পরিবেশ দেয় না। অর্থিক ছাড় দিয়ে পড়ার সুযোগও দেয়। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাফল্য পেলে পরিবারের ছবিটাই বদলে যায়। এভাবেই শত শত পরিবারের ছবি বদলে যাচ্ছে সবার অজান্তেই। ■

মনসুর আলম

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪৯৬৭

রাঁচি মেডিকেল কলেজ, ঝাড়খণ্ড

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত-ঘেষা রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বেশ কিছু এলাকায় আল-আমীন মিশনের বিশেষ পরিচিতি গড়ে উঠেছে। একাধিক পড়ার সাফল্য সেই পরিচিতির বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করেছে। ফলে সচেতন অবিভাবক বা সতর্ক আল-আমীন মিশনে



পড়তে আসছেন। ২০২৬ সালের নিট পরীক্ষায় ৪৪১২ ব্যাঙ্কারী নাওয়াজ মুনতাসিরের বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। ঝাড়খণ্ডের আর-এক ছাত্র মনসুর আলম এ-বছরেরই নিট পরীক্ষায় অত্যন্ত ভালো ফল করেছে। তার সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক হয়েছে ৪৯৬৭। পেয়েছে ৬২১ নম্বর। রাঁচি মেডিকেল কলেজে সে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু সে পড়তে চায় কলকাতার কলেজে। পি জি তার প্রথম পছন্দ। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দফার কাউন্সেলিংয়ে সে সর্বভারতীয় কোটার পড়ার সুযোগ পেয়ে যাবে বলে আশাবাদী।

মনসুর আলমের বাড়ি ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পাকুড় জেলার বিকুরহাটি গ্রামে। তার পিতা রফিকুল ইসলাম উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। একটা ওষুধের দোকান চালান। মা সাগিরা বেগম বি.এ. পাস। প্রাইমারি স্কুলের

মিশনে ফিরে আসা নিয়ে তার বক্তব্য, “নিটের প্রস্তুতির জন্যে আল-আমীন মিশন আনপ্যারালাল। যে-পরিবেশ দেয় তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। কোনো ডিসট্রাকশন নেই।

প্যারটিচার তিনি। তিন সন্তানের মধ্যে মনসুর বড়ো। বাকি দু-জন পড়াশোনা করে। তিন জনেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছে।

মনসুর আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস এইট থেকে। পড়ত বীরভূমের চিনপাইয়ের ইংরেজি মাধ্যম শাখায়। ২০২৩ সালে সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষার সে পেয়েছিল ৯০.২ শতাংশ নম্বর। এরপর উচ্চ-মাধ্যমিকের পড়াশোনার জন্যে তাদের রাজ্যেই ফিরে যায়। ২০২৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করার পরে ডাক্তার হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে আল-আমীন মিশনে আবার ফিরে আসে। নিটের কেচিং নের হাওড়ার নয়াবাজ শাখায়। এক বছর কেচিং নেওয়ার পর পরীক্ষার বসে সে আশাতীত ফল করেছে। মা-বাবা ও নিজের স্বপ্ন পূরণের ছাড়পত্র হাতে পেয়েছে।

কীভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে জানতে চাইলে সে জানায়, “প্রথমে এনসিইআরটির বই পড়েছি ভালো করে। পরে অন্যগুলোও পড়েছি। ফিজিক্স, বায়োলজি, কেমিস্ট্রি সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়েছি। বায়োলজি দেয় সিলেকশন আর ফিজিক্স দেয় ব্যাঙ্ক। কোর্সেচন থ্যাটকটস করেছি খুব। জেইই মেইনস এবং নিট প্রিভিয়ার্স ইয়ারস কোর্সেচন।”

মিশনে ফিরে আসা নিয়ে তার বক্তব্য, “নিটের প্রস্তুতির জন্যে আল-আমীন মিশন আনপ্যারালাল। যে-পরিবেশ দেয় তা অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। কোনো ডিসট্রাকশন নেই। নিটের মতো পরীক্ষার জন্যে বা একান্ত জরুরি।” ■

আফজল হোসেন

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৫৩১৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

কিছু টুকরো টুকরো ছবি দিয়ে একটা পরিবারের ছবি আঁকা বাক।

চিত্র ১: ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়া এক মা এক মেয়ে আর এক ছেলেকে নিয়ে ভাইয়েদের সঙ্গে থাকেন। শাড়ি, সাঁতারাবের ওপর কাঁথাস্টিচের সেলাই করে সংসার চালান। ভাইয়েরা হেল্প করেন।



চিত্র ২: ওই ছেলেটিকে তার ছোটোমামা কাছের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনেছেন। ক্লাস ওয়ানে ভর্তি করতে চান। কর্তৃপক্ষ শূনে মাসে ১০০ টাকা বেতনে পড়াবেন জানান। যদি টেস্টে প্রথম তিনের মধ্যে আসতে পারে তাহলে সেটাও মুকুব করা হবে। বাচ্চাটি শুনল। ভালো ফল করল। বেতন মুকুব হল।

চিত্র ৩: বাড়ি থেকে স্কুল যেতে হয় ভ্যানে করে। ভ্যানওয়ালা কাকু সবার থেকে নেন সাড়ে তিনশো টাকা। ছেলেটির থেকে নেন একশো টাকা।

চিত্র ৪: ক্লাস কাইভ। আগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিক বিভাগে এবার। আবাসিক। কর্তা শুনলেন সবটা। থাকা-খাওয়া-পড়াশোনা বাবদ মাসিক বেতন হিসেবে সর্বনিম্ন যেটুকু নেওয়া হয় অতি দরিদ্র পরিবারের সহযোগ হিসেবে, সেই ২৯০ টাকাও মুকুব করে দিতে চাইলেন। মামা

বললেন, “না স্যার, ওইটুকু দিতে দিন।”

চিত্র ৫: কাইভে পড়া ছেলে-মেয়েরা কতটুকুই-বা নিজেব খেয়াল নিজেই রাখতে পারে। ছেলেটি একদিন হস্টেলে মশারি না টাঙিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। কেলে করে তুলে বেড়ে ভালো করে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দিলেন। ছেলেটি আধঘুমে চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল থিয় বরজাহান স্যার। তাঁর স্পর্শ আজীবনের জন্যে হৃদয়ে লুকিয়ে রাখল ছেলেটি। মোজাকফর স্যার, অশরফ স্যারদের মতো যাঁরা বইপত্র দিয়ে বা অন্যভাবে হেল্প করেছেন তাঁদেরও ভোলেনি।

চিত্র ৬: বাড়িতে মা আর দিদি। দিদিকেও মা পড়িয়েছেন। বি.এ. পাস করেছেন। দুই সন্তানকে মানুষ করতে মা ভোর বেলা পাঁচ-ছ কিলোমিটার হেঁটে গিয়ে বাস ধরেন। বোলপুর থেকে সেলাইয়ের কাপড় আনতে বান।

চিত্র ৭: সাল ২০২০। ছেলেটির মাধ্যমিক পরীক্ষার ৯০.৪ শতাংশ নম্বর। এবার বর্ধমান শাখায়। উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯২.৪৩ শতাংশ নম্বর। উচ্চ-মাধ্যমিকে পড়ার সময় ছোটোমামা খরচ দিতেন কিছু। তিনি বিয়ে করেছেন। তাঁর ড্রাইভারির কাজেও উপার্জন হঠাৎ কমে যায়। উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করেও ব্যাবহুল নিটের কেচিং না নিয়ে বাড়ি থেকেই পড়ে। বছর শেষে ভাবে— হবে না এভাবে। সেক্রেটারি স্যারের কাছে যান। শূনে তিনি বকেন। বলেন, “মিশন তো তোমাদের মতো ছেলে-মেয়েদের জন্যেই।” গোলবাড়ি শাখায় এক বছর। নিট পরীক্ষা। ৪৮.৫ নম্বর। লক্ষ্য ছুঁতে ব্যর্থ মাত্র পনেরো-কুড়ি নম্বরের জন্যে। হতাশা। মা, মামা, প্রাইমারিতে পড়াবন্ধু কাইফের মেটাল সাপোর্ট। আরও এক বছরের লড়াই শুরু। পড়াশোনা এবার খলিসানি শাখায়। প্রতিটা টেস্ট নিট কাইনাল ভেবে পড়া, পরীক্ষা দেওয়া। নিট রেজাল্ট ২০২৬। ছেলেটির অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক ৫৩১৪। স্টেট ব্যাঙ্ক ৯৮। মেডিকেল কলেজ, কলকাতায় ভর্তি।

ছেলেটির নাম আফজল হোসেন। ২০২৬ সালে আল-আমীন মিশন থেকে ডাক্তারি পড়তে সুযোগ পাওয়া পাঁচ শতাধিক পড়ুয়ার একজন। বাড়ি বীরভূম জেলার সদাইপুর থানার জামখোলিয়া গ্রামে। ■

ফারহানা সিদ্দিকা

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৫৭০৪

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

পথ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মহম্মদ হাদীউজ্জামান কলকাতার পি জি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরেই কর্মরত। তিনি ফারহানার ছোটোআবু (চাচা)। এ ছাড়া তার নিকট - আত্মীয়ের মধ্যে কয়েক জন চিকিৎসকও রয়েছেন। তাঁরা সবলেই আল - আমীনেব খাস্তনী। ২০১৭ সালে ফারহানা ক্লাস ফাইনে মিশনে ভর্তি হলেও সেও যে চিকিৎসক হতে যাচ্ছে, এটাই ছিল ভবিষ্যৎ।

বীরভূমের মুরারই থানার বুপরামপুর থামের মহম্মদ শামশুল হোদা বিজ্ঞানে স্নাতক। তিনি থাইমারি স্কুলের শিক্ষক। উচ্চ-মাধ্যমিক পাস কনিজ ওরহিদা তাঁর স্ত্রী, গৃহকর্ত্রী। ফারহানার একমাত্র ভাই মহম্মদ জামাল হোদা আল-আমীনের নয়রাজ শাখার একাদশ শ্রেণির ছাত্র। মেধাবী ফারহানার পঞ্চাশত শিক্ষার আরম্ভ তার আব্বার ফতেপুর থাইমারি স্কুলে। পঞ্চম শ্রেণিতে মিশনের পাথরচাপুড়ি ক্যাম্পাসে শুরু হয় ফারহানার আল-আমীনে লেখাপড়ার জীবন। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিকের পরীক্ষায় বসে খলতপুর ক্যাম্পাসের অবীনে। ২০২৩-এ মাধ্যমিক ও ২০২৫-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৯৪.৩ ও ৯৪.৮ শতাংশ। রবিন ইয়ার ২০২৫-এ নিটে তার প্রাপ্ত নম্বর সন্তোষজনক— ৪২১। এর পরে



নিটের নিবিড় প্রত্নতির জন্যে খলতপুর থেকে সে চলে আসে হাওড়ার অক্ষুহাটি শাখায়। বিজ্ঞান, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির এনসিইআরটির বইয়ের পাশাপাশি ফ্যাকাল্টিদের তত্ত্বাবধানে সমস্যা ও সমাধানের অনুশীলনে করে দিনতিপাত। শেষমেষ ২০২৬-এর নিটের রেজাল্ট বের হলে দেখা যায় ফারহানার বাড়ি ও এলাকার খুশির ছটা। জনপদে চাউর হয়ে যায় মাস্টারের মেয়ে ও ডাক্তারের ভাইবী ফারহানা ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করেছে। এর আগে থামের চার জন এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পেলেও, মেয়েদের মধ্যে সেই সাকল্যের কৃতিত্বে বিতীয় নাম ফারহানা। মিক্তিমুখ ও শুভেচ্ছা জানাতে জড়ো হয় প্রতিবেশী ও থামবাসীরা। উল্লেখ্য, প্রথম জন আখতারী পারভিন, যিনি মিশনের খলতপুর ক্যাম্পাস থেকে ২০২২ সালে নিটে ৬৫৩ নম্বর পান। তাঁর সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ছিল ৩৯১৫। আখতারী মেডিকেল কলেজ, কলকাতার এম.বি.বি.এস.-এর চতুর্থ বর্ষের ছাত্রী।

থির বিষয় গণিত। নেতাজী সুভাষকান্ত বসু ও প্রান্তন রাস্ত্রপতি এ পি জে আবদুল কালাম তার থির ভারতীয়। তার ইচ্ছে ভবিষ্যতে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হওয়ার। নিটে সাকল্য পেতে ফারহানার নিদান হল, ক্লাস নাইন-টেন এবং ইন্সটিউট-টুয়েলভে বিজ্ঞানের বিকসগুনিকে ক্লাসে গুরুত্বের সঙ্গে মনোযোগ দিয়ে আয়ত্ব করতে হবে। ঘটিতি থাকলে তৎক্ষণাৎ সেগুলো পুরণে সচেষ্ট হতে হবে। এনসিইআরটির বই খুঁটিয়ে পড়া এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন বকমের টেস্টের মাধ্যমে নিজের ফাঁকফোকর পূরণ করাও জরুরি। সবচেয়ে বড়ো বিষয়, নিজের মস্তিষ্কে অ্যালার্ম সেট করতে হবে, যেটা শুধু ঘুম থেকে জাগাতে সাহায্য করবে না, নিটের প্রত্নতিতে ভাটা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সতর্কও করবে।

বাঙালি ব্যক্তি মহাত্মা বিদ্যাসাগর ও মহীয়সী বেকেরার শিক্ষা প্রসারের অবদানের প্রতি গভীরভাবে প্রশ্রয় ফারহানা। অদ্ব-ভবিষ্যতে নিঃস্বার্থভাবে দৃষ্টি ও চিকিৎসাহীন সুবিধাবঞ্চিতদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আল-আমীন মিশনের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, ইন-চার্জ ও পড়ুরাদের দেখাশোনার নিযুক্ত সমস্ত স্টাফদের প্রতি কৃতজ্ঞ ফারহানা। ■

সৈয়দ মুরসালিন রহমান

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৬০৯২

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সুতাহাটা বাজারে যদি কেউ যান দেখবেন চারিদিকে অনেক

দোকান পাট।

সেখানে স্টেশনবি

দোকান যাঁরা

চালান তাঁদেরই

একজন সৈয়দ

মতিবুর রহমান।

বাড়ি একটু দূরের

বারাতলা থামে।

উচ্চ-মাধ্যমিক পাস

মতিবুর সাহেব ওই

দোকান চালিয়েই

জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁর স্ত্রী নাসিমা ইয়াসমিন পড়েছেন ক্লাস নাইন পর্যন্ত। তিনি কোনো আর্থিক কাজের সঙ্গে যুক্ত নন, সংসার সামলান। তাঁদের দুই সন্তান। সৈয়দ মুরসালিন রহমান আর সাইনা খাতুন।

থামবাংলার হাজার হাজার পরিবারের মতো খুবই সাধারণ একটি পরিবার। কিন্তু সেই সাধারণ পরিবারটিই অসাধারণ হয়ে ওঠার দিকে এগিয়ে চলেছে ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্তের জোরে। সৈয়দ মতিবুর রহমান সাহেব বেশি দূর পড়াশোনা না করতে পারায় মনে আক্ষেপ একটা ছিলই। তাই তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর যৌথ স্বপ্ন ছিল ছেলে-মেয়েকে কেবল উচ্চশিক্ষিত করাই নয়, মর্যাদাপূর্ণ পেশায় প্রতিষ্ঠিত করা।

সেই স্বপ্ন নিয়েই তাঁরা তাঁদের পুত্র মুরসালিনকে আল-আমীন



মিশনে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পাস করার পর মিশনের নয়াবাজ শাখায় একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হয় মুরসালিন। আল-আমীন মিশনের পড়াশোনার পরিবেশ, সার্বিক ব্যবস্থাপনা উজ্জীবিত করে তাকে। ২০২৫ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে দুর্দান্ত ফল করে। পায় ৯২ শতাংশ নম্বর। একইসঙ্গে নিট পরীক্ষা দিয়ে বানিঙে পায় ৪৮৯ নম্বর। হাতে গোণা কয়েক নম্বরের জন্যে স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। সাময়িক হতাশ হলেও তা কাটিয়ে ওঠে বাবা ও মিশনের সুপার স্যারের উৎসাহে। আরও গভীর অধ্যবসায় দিয়ে পড়াশোনা শুরু করে। সেই অধ্যবসায়ের দৌলতেই এ-বছরের নিট পরীক্ষায় অসাধারণ সফল্য পেয়েছে মুরসালিন। ৬১৫ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় জুয়ে তার ব্যাঙ্ক হয়েছে ৬০৯২। স্টেট ব্যাঙ্ক হয়েছে ১২৯। কলকাতার মর্যাদাবাহী মেডিকেল কলেজ ইনসটিটিউট অব পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ভর্তি হয়েছে। অন্যদিকে তার বোন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি হয়েছে। অতি সাধারণ এক পরিবার অদূর-ভবিষ্যতে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ারের পরিবার হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে চলেছে। পড়াশোনাকে মূল্য দিলে কীভাবে চারপাশ বদলে যায়, তা আর-কয়েক বছরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে সকলের কাছে।

ভবিষ্যতে সার্জন হতে চাওয়া মুরসালিন তার নিটপ্রত্নুতি বিষয়ে জানিয়েছে— “আমি ভোর বেলা পড়তে বসতে পছন্দ করি। সাড়ে চারটের উঠে নামাজ পড়ে নিয়ে পড়তে বসতাম। ক্লাস ইন্সপেক্টর থেকেই প্রত্নুতি শুরু করি। নিট পরীক্ষার ওপরে ফোকাস রেখেই পড়াশোনা করেছি। বায়োলজি আর ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির জন্যে এনসিইআরটির বই পড়েছি। জেইই মেইনস ও অ্যাডভান্সের প্রিভিয়াস ইয়ারস কোর্সেচন সমাভ করেছে।”

যারা নিট পরীক্ষার জন্যে প্রত্নুতি নিচ্ছে বা নিতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে মুরসালিনের পরামর্শ— “প্রিপারেশন যেমনই থাকুক সব টেস্ট দাও। ভুলগুলো খুঁজে বের করো। সেগুলো সংশোধন করো।” ■

সাইন আন্তার

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৬৮৪৫

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মুর্শিদাবাদ জেলার
রানিতলা থানার
বাবুপুর গ্রাম।
এখানকার সরকারি
খাইমারি স্কুলটির নাম
বাবুপুর খাইমারি স্কুল।
খাইমারিতে প্রথম
হওয়া তেমন কোনো
বড়ো বিষয় নয়।
বিশেষ করে এলাকার
যদি পড়াশোনার চল
তেমন না থাকে।



এলাকার ছেলে-মেয়েদের খাইমারির পড়া শেষ হলে কাছের নসিপুর হাই স্কুলে ভর্তি হতে হয়। এটিও সরকারি স্কুল। বাবুপুর গ্রামের ছেলে সাইন আন্তার খাইমারির কন্ট বয়। হাই স্কুলে গিয়ে এক ধাপ নীচে নেমে হয় সেকেন্ড। ক্লাস ফাইভের দিকে অঙ্কে একটু কাঁচা ছিল সাইন। খাইভেট টিউটর মেহেদি হাসান সেই কাঁচা ভিত্তিকে পোস্ত হতে সাহায্য করেন। পড়াশোনার প্রতি বোঁক দেখে তিনি আল-আমীন মিশনে ভর্তির পরামর্শ দেন। সন্তান মিশনে সুযোগ পাওয়ার পিতার ভরসা অনেকখানি বেড়ে গেল। বড়ো স্বপ্ন দেখা শুরু করলেন। মতিয়ার রহমান কম পড়াশোনা জানা একজন সাধারণ কৃষক। ক্লাস এইট অবধি পড়েছেন। তাঁর ত্রীচাঁদবানু বিবির পড়াশোনা অবশ্য একটু বেশি। তিনি উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। গৃহবধূ। পুত্র সাইন ও কন্যা নাহিদা পারভিনকে নিয়ে তাঁদের সংসার। দম্পতির সম্মিলিত স্বপ্ন ছেলে-মেয়েকে পড়াশোনা শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করা। বড়ো স্বপ্ন দেখার মতো

মজবুত আর্থিক ভিত না থাকলেও বড়ো স্বপ্ন দেখার জন্যে যে-সাহস লাগে তা পুরোমাত্রায় আছে মতিয়ার রহমানের। সেই সাহস নিজের সন্তানের মধ্যেও ধীরে ধীরে সংস্করিত করে দিলেন তিনি। যে সাইন আন্তার মাধ্যমিক পর্যন্ত ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখেনি পিতার উৎসাহে একাদশ শ্রেণি থেকেই তা দেখতে শুরু করে। অবশ্য সাইন বড়ো স্বপ্ন দেখেই বা কী করে। বর্তমান সময়ে মাধ্যমিকে মাত্র ৮১ শতাংশ নম্বর পেয়ে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন দেখা একটু বেশিই আশা করা। কিন্তু এমন নম্বর প্রাপকরাও যে হচ্ছে আর চেষ্টার যেকোনো স্বপ্ন সফল করতে পারে তা সাইনের সাক্ষ্যই বলে দেয়।

সাইন আন্তার ২০২৬ সালের নিট পরীক্ষায় সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক করেছে ৬৮৪৫। পেয়েছে ৬১২ নম্বর। সে আল-আমীন মিশনে পড়েছে ক্লাস নাইন থেকে। প্রথমে পড়ত বেলডাঙা ক্যাম্পাসে। উচ্চ-মাধ্যমিক পড়েছে সিউড়ি ক্যাম্পাসে। ২০২৪ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় পায় ৮৭.৪ শতাংশ নম্বর। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার পর নিটের জন্যে দু-মাসের ক্র্যাস কোর্স করতে খলতপুর আসে সিউড়ি শাখার ন-জন ছাত্র। সাইনকে নিয়ে তিন জন ডাক্তার হওয়ার ছাড়পত্র পেয়ে গেল। রানিঙে একজন সফল হয়। রানিঙে সাইন পায় ৪১৬ নম্বর। এরপর খলতপুর ক্যাম্পাস থেকেই এক বছরের নিট কেটিং নেয়। ২০২৫ সালে কাট-অব-মার্কস হয় ৫০৬ নম্বর। সাইন পায় ৪৯৯ নম্বর। মাত্র ৭ নম্বরের জন্যে যখন ফিরতে হয় সাক্ষ্যের কাছে গিয়েও তখন হতাশা আসাই স্বাভাবিক। আবার বোঝান। আবার পড়ার মন বসাতে প্রাথমিকভাবে অসুবিধা হলেও কিছু দিনের মধ্যে ছন্দ ফিরে আসে। সিলেবাস শেষ করাই ছিল, এ-বার পরীক্ষার ওপর জোর দেয় সাইন। প্রতিটা টেস্টে ভুলগুলো শুধরে আরও ভালো করার চেষ্টা করে। মা-বাবার স্বপ্ন আর নিজের ইচ্ছে পূরণ করে ডাক্তার হতে চলেছে সাইন। সে মেডিকেল কলেজ, কলকাতায় ইতোমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে।

ছেলের সাক্ষ্যে উৎসাহিত হয়ে মতিয়ার রহমান সাহেব এখন স্বপ্ন দেখছেন মেরেকেও ডাক্তার করার। সামান্য পড়াশোনা জানা একজন গ্রামীণ কৃষক তাঁর ছেলেকে ডাক্তার করার স্বপ্ন জুঁয়েছেন। আল-আমীন মিশন পাশে ছিল বলে সেই স্বপ্ন পূরণ সহজ হয়েছে। ■

মহ. মাসেদুল হোসেন গাজী

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৭০০৯

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

“আমাদের পাঁশের পাড়ার একজন এন আর এস থেকে, একজন কল্যাণী থেকে, আর একজন

... মানে অনেকগুলো।

সবাই আল-আমীন

মিশন থেকে।” এটা

ছিল উত্তর। ২৫টা

ছিল— তোমার ৭

এমে মিশন থেকে কত

জন ডাক্তার হয়েছে বা

পড়ছে। ওই তালিকার

এ-বছর যুক্ত হয়েছে

উত্তরদাতার নামও।

আগে যাঁরা

ডাক্তার হয়েছেন তাঁদের কারো সঙ্গে কথা না হওয়ায় জানা যায়নি

কেমন পরিবার থেকে উঠে এসেছেন তাঁরা। তবে আলাজ করা যায়।

আল-আমীন মিশন মূলত রাজ্যের পশ্চাৎপদ সংখ্যালঘু মুসলমান

সমাজের উন্নয়নে জড়িয়ে থাকা সংস্থা। রাজ্যের সংখ্যালঘু মুসলমান

সমাজের চোন্দা আনাখোটে-খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। কৃষক, দিনমজুর,

রাজমিস্ত্রি, ফেরিওয়ালা, বিড়িশ্রমিক, ড্রাইভার, নানা হাতিয়ার কাজের

সঙ্গে যুক্ত মানুষজন, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। সমাজের কিছু সচ্ছল পরিবারের

ছেলে-মেয়ে মিশনে পড়লেও মিশনের সার্বিক কাজ থেকে লাভবান

হওয়া পরিবারের বেশিরভাগ অংশই পূর্বোক্ত নিম্নবিত্ত শ্রেণির। এবার

যার সাফল্যের কথা শুনবেন, সেও একজন নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান।

শহরে হোক বা গ্রামে আমাদের পাড়ার বা দরজার নিত্যদিন কিছু

১৬ | সাক্ষ্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬



বিক্রি করতে বা কিনতে কিছু মানুষ আসেন। ফেরি করেন বলে আমরা ফেরিওয়ালা বলি। খুব গভীরভাবে দেখলে আমরা প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ফেরি করি, বিক্রি করি— কেউ সেবা, কেউ দ্রব্য। যাঁর কথা বলছি তিনি কলকাতা মহানগরে পুরোনো কগজ কিনে বিক্রি করেন। নাম মোজাফফর গাজী। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার উন্মিখ ধানার নাজরা গ্রামে বাড়ি। পড়াশোনা সামান্য। ক্লাস এইট অবধি। স্ত্রীমুর্শিদাবিবি কোনোরকমে নাম সই করতে পারেন। তিন ছেলে। বড়ো থাকে নানাবাড়িতে। দু-জন সঙ্গে থাকে। ছোটোসন্তান এ-বার ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। বলা ভুল হল, জীবনের এক জ্বর থেকে উচ্চতর নতুন জ্বর প্রবেশের অধিকার অর্জন করেছে। নিট পরীক্ষার সর্বভারতীয় জুরে ব্যাঙ্ক করেছে ৭০০৯। সেট ব্যাঙ্ক ১৫৬। ইনসটিটিউট অব পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিকেল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ ভর্তি হয়েছে। ওই ছেলেটি, যার নাম মহম্মদ মাসেদুল হোসেন গাজী, যে-দিন অ্যাডমিশন পরে স্টেথোস্কোপ হাতে নিয়ে রোগী দেখবেন, সেই দিন চোখের কোণ কি চিকচিক করে উঠবে না মা-বাবার! কনভোকেশনের দিন মা-বাবা-দাদাকে পাশে নিয়ে যে-ছবিটি উঠবে তার মূল্য পরিমাপ করার একক সম্ভবত এখনও অবিদ্যুত হয়নি।

মাসেদুল ক্লাস সিঙ্গ থেকে আল-আমীন মিশনে। সেটা ২০১৭ সাল। তালদি ক্যাম্পাস। ২০২২-এ মাধ্যমিক। ৯৪.৫ শতাংশ নম্বর। ২০২৪-এ উচ্চ-মাধ্যমিক। ৯০ শতাংশ নম্বর। মেদিনীপুর ক্যাম্পাস। দু-বছর নিট প্রত্নুতি— পাঁচুড় ক্যাম্পাসে। ২০১৭ থেকে ২০২৬— ১০ বছর, এই দীর্ঘ সময় মিশন পাশে থেকেছে মাসেদুলের। খুবই সামান্য বেতনে পড়েছে।

বড়দার ছেলে গতবছর ভর্তির পরীক্ষায় বসেছিল। পাস করেনি। এ-বছর আবার বসবে। এক চাচাতো ভাই, ক্লাস ফোর্স পড়ে। সেও এ-বার ভর্তির পরীক্ষা দিচ্ছে।

মিশন থেকে পড়ে অনেকে ডাক্তার হয়েছে। ভালো পেশার গেছে। ভবিষ্যতেও হবে। প্রজন্মের পর প্রজন্মের ভরসার জায়গা আল-আমীন মিশন— যেখানে রচিত হয় জীবন বদলের স্বপ্ন। ■

সেখ আতাউল রহমান

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৭৯৫৫

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

কামবুল হাসান

সেখ। বয়স ৪৫

বছর। শিক্ষা চতুর্থ

শ্রেণি পর্যন্ত।

ঠিকানা— সাং-

গোপডিহি, থানা-

নানুর, জেলা- বীরভূ

ম। পেশা- চাষাদি।

আতাউল্লের

আববা কামবুল

সংগ্রহের ব.

পরিচিতি বাচক



বাংলাদেশের মধ্যে একটি ক্ষেত্রে বদল হয় মাঝেমাঝে। হযে যান পরিবারী শ্রমিক। রাজমিস্ত্রির কাজে ভিনবাজ্যে যেতে হয়। পরিবারী শ্রমিকদের ওপর অনেক বিপজ্জনক ঘটনা ঘটছে আজকাল। আশঙ্কার মেঘ মনে উঁকি দিলেও তা পাশ কাটিয়ে, বাড়ির পিছুটান ফেলে বেখে চলে যেতে হয়। সংসার চালাতে, ভাত-কাপড়ের সংস্থান করতে। জীবন মুঠোর নিয়ে ভিনবাজ্যে যাওয়ার এই টানটাপাড়ে ইতি পড়তে চলেছে এবার। তাঁদের সন্তান সেখ আতাউল রহমান আলোকময় জীবনে নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম হয়ে উঠতে চলেছে।

কন্ঠের দিনের অবসান যদি হয় সন্তানের হাত ধরে তাহলে বাবা-মায়ের কাছে তারচেয়ে বড়ো আনন্দের আর-কিছু থাকে না। ২০২৬ সালের নিট পরীক্ষার ফল বের হওয়ার দিনটা জীবনের সব

থেকে স্মরণীয় দিন হয়ে ওঠে। উপায় থাকলে তারিখটা সোনার অক্ষরে লিখে রাখার ইচ্ছে হয় পিতা কামবুল হাসান ও মা শোভা বেগমের। তাঁদের অনেক লড়াই-সংগ্রাম সার্থক করেছে ছোট আতাউল। নিটে ব্যাঙ্ক করেছে ৭৯৫৫।

আতাউল অবশ্য গতবছরই নিশ্চয়তা দিয়েছিল বাবা-মাকে। সে ২০২৫-এর নিট পরীক্ষার পেয়েছিল ৫০৬ নম্বর। একদম শেষ রাউন্ডে কাট-অব-মার্কস আসে ৫০৬। তখন আবার নতুন করে থতুতি শুরু করে দিয়েছে। দু-তিন মাস পড়া হয়ে গেছে। এবার ভর্তি হলে ভালো কলেজে হবে না। আশ্বিন্দাস ছিল যে সামনের বছর ভালো কলেজে পড়ার সুযোগ পাবেই। তাই ভর্তি না হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যায়। আশা অনুযায়ী ভালো ফল করে এ-বার সে কলকাতার পি জি হসপিটালে এম.এম.বি.বি.এস.-এ ভর্তি হয়েছেন।

আতাউলদের অন্ধকার ঘর আলো করে তোলায় কাজে আল-আমীন মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আতাউল মিশনে আসে ক্লাস কাইভে। ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছে পাপুড়ি শাখার। ২০২৩ সালে মাধ্যমিকে পার ৯১ শতাংশ নম্বর। এরপর আসে খলতপুর শাখার। ২০২৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিকে পার ৯৫.৮ শতাংশ নম্বর। টি-৪০ থুপে কোচিং নিয়ে বার্নিঙে ৫০৬ নম্বর পার। খলতপুর শাখাতেই আরও এক বছর নিট থতুতি নিয়ে এ-বছর সে চমকপ্রদ সাফল্য পেয়েছে। ক্লাস কাইভ থেকে নিট-সাফল্য পাওয়া পর্যন্ত যে দীর্ঘ পথ, তা পাড়ি দিতে আল-আমীন মিশন শক্ত করে ধরে থেকেছে আতাউলের হাত। খুব সামান্য বেতন দিয়ে তাকে পড়ার সুযোগ দিয়েছে।

আতাউলদের পাশের বাড়ির ছেলে সফিউল ইসলাম। মিশনের প্রাঙ্গণী। তার পিতাও চাষবাস করেন। বর্তমানে কল্যাণী, এইমসে পড়ছে। তাকে দেখেই মিশনে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। সমিউল উদ্বুদ্ধ করেছিল আতাউলকে। আতাউলের সাফল্য উদ্বুদ্ধ করবে অন্য কাউকে। সাফল্যের ধারা এভাবেই বয়ে চলেছে অবিরত। ■

ইমরান আলি

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৮০৩২

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

“মেধা দিয়ে সবকিছু হয় না। একটা সিস্টেম দরকার, যার সাহায্যে মেধা সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারে। আল-আমীন মিশন সেই সিস্টেমটা দিয়ে চলেছে।

অনেক মেধাবী পড়ুয়া টাকার অভাবে হারিয়ে যায়। বাবা-দাদারা পরিবারী শ্রমিকের কাজ করে খরচ জুগিয়েছেন। তাই তাঁদের মূল্যায়ন করা কঠিন।

সফল হতে গেলে অনেক চাওয়া-পাওয়াকে কুরবানি দিতে হয়। বাড়ির অনেক উৎসব-অনুষ্ঠানে থাকা হয় না। শরীর-মন খারাপ থাকলেও তাকে পাত্তা না দিয়ে পড়াশোনা করতে হয়।”

২০২৬ সালের নিট পরীক্ষার ৮০৩২ ব্যাঙ্কারী ইমরান আলিকে পশ্চ করা হয়েছিল তোমার সাফল্যে আল-আমীন মিশন, অভিভাবক ও তোমার নিজের ভূমিকা খুব সংক্ষেপে কীভাবে ব্যাখ্যা করবে। উত্তরে ওপরের কথাগুলো বলেছে ইমরান। সে নিট-সাফল্য পেয়ে মেডিকেল কলেজ, কলকাতার এম.বি.বি.এস. কোর্সে ভর্তি হয়েছে।

ইমরানের বাড়ি মালদা জেলার গাজোল থানার রামনগর গ্রামে। পিতা মফিজুল হক মাধ্যমিক পাস। তিনি প্রান্তিক কৃষক। মা সাবিনা ইয়াসমিনের

১৮ | সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬



সফল হতে গেলে অনেক চাওয়া-পাওয়াকে কুরবানি দিতে হয়। বাড়ির অনেক উৎসব-অনুষ্ঠানে থাকা হয় না। শরীর-মন খারাপ থাকলেও তাকে পাত্তা না দিয়ে পড়াশোনা করতে হয়।”

পড়াশোনাও মাধ্যমিক পর্যন্ত। ইমরানের দুই দাদার একজন পড়েছেন উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত, অন্য জন ক্লাস নাইন পর্যন্ত। দু-জনেই পরিবারী শ্রমিক। ভিনরাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। এক দিদি। তিনি বিবাহিত। সবার ছোটো ইমরান।

ইমরান আল-আমীন মিশনে পড়েছে একাদশ শ্রেণি থেকে। পড়ত খলতপুর ক্যাম্পাসে। ২০২৫ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার সে পেয়েছিল ৯৫.৬ শতাংশ নম্বর। খলতপুর ক্যাম্পাসে নিটের জন্যে টি-৪০ গ্রুপ স্পেশাল কোচিং নিয়েই রানিঙে সফল হতে পারেনি। পেয়েছিল ৪৭৭ নম্বর। ভবিষ্যতে সে কোন বিষয়ে স্পেশালিস্ট হতে চায় জানতে চাইলে জানায়— “নেফ্রলজিস্ট হতে চাই।” কারণ, সে নিজে কিডনির রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। অপারেশনের পর সুস্থ হয়েছে। এই জন্যে পড়াশোনাতেও ব্যাঘাত ঘটে। তবে তা অতিরিক্ত পড়াশোনা করে পূরণ করে নেয়।

নিট-সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে টি-৪০ করে উচ্চ-মাধ্যমিকের সঙ্গেই নিটের প্রভুতি বিশেষ কার্যকর হয়েছে বলে উল্লেখ করেছে ইমরান। যারা প্রভুতি নিতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে ইমরানের পরামর্শ— ক্লাস ইন্সট্রেন থেকেই পড়া শুরু করা দরকার। রিভিজন আর মক-টেস্ট যত বেশি পারা যায় দিতে হবে। ক্লাস বাদ দিয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ৮ ঘণ্টা পড়া দরকার। ■

হাসিবাতুননেশা

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১০৮৪৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান এলাকায় আপনি যদি কখনো যান দেখবেন
থায় প্রতিটি বাড়িতে
চলছে বিড়ি বাঁধার
কাজ। একদিকে একটা
শ্রেণির মানুষের
থাকুর্ষের শেষ নেই।
উলটেদিকে কিছু
বাড়ি আজও টালির
চাল, প্লাস্টিক-ত্রিপলে
ছাওয়া। সাচার
কমিটির রিপোর্ট



জানিয়েছিল গোটা দেশের মধ্যে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সবচেয়ে বেশি
পিছিয়ে পড়া যে ক-টি জেলা আছে তার মধ্যে একটির নাম মুর্শিদাবাদ।
অন্যদিকে আল-আমীন মিশন থেকে যে শ পাঁচেক পড়ুয়া ডাক্তারি পড়ার
সুযোগ পায় সেখানে জেলাভিত্তিক তালিকায় দেখা যাচ্ছে সবার ওপরে
আছে মুর্শিদাবাদ। কখনো শতাধিক কখনো দেড় শতাধিক পড়ুয়া থাকে
শুধু এই জেলা থেকেই। এবং এইসব পড়ুয়ার মধ্যে ৮০ ভাগই দরিদ্র
পরিবারের।

কয়েক দশকের প্রচেষ্টায় আল-আমীন মিশন দরিদ্র ও অশিক্ষার
অধিকারে ভুবে থাকা শত শত পরিবারকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠিত করেছে
আলোর ভুবনে। সেরকমই একটি পরিবার হল ধুলিয়ানের লক্ষ্মীপুর
থামের মহম্মদ শাহাদাত হোসেনের পরিবার। শাহাদাত হোসেন থ্যাজুয়েট।
তিনি থামী চিকিৎসক হলেও আগে অনেক দিন বিড়ি বাঁধাই ছিল তাঁর

জীবিকা। তাঁর স্ত্রী আয়েসনারা খাতুন মাধ্যমিক পাস। তিনি নিয়মিত
বিড়ি বাঁধেন। চার মেয়েকে মানুষ করার আশায়, সাংসারিক কাজ সেয়ে
যে উদ্বৃত্ত সময়টুকু পান সেটুকু ব্যয় করেন দুটো পরসার জন্যে। এই
পরিবারের চার মেয়ের মধ্যে দু-জন যদি ডাক্তার হয়ে যায় তাহলে বিস্মিত
না হয়ে উপায় থাকে কি! শাহাদাত সাহেবের বড়ো মেয়ে তৈয়বাতুননেশা
বর্তমানে ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.
পড়ছেন। মেজো মেয়ে হাসিবাতুননেশা নিউ পরীক্ষায় ১০৮৪৯ ব্যাঙ্ক
করে এ-বছর ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। তর্তি হয়েছে মেডিকেল
কলেজ, কলকাতার মতো ঐতিহ্যবাহী মেডিকেল কলেজে। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
হল তৈয়বাতুন ও হাসিবাতুন— দু-জনেই আল-আমীন মিশনের ছাত্রী।
তৃতীয় কন্যা সাহিবাতুননেশাও বর্তমানে আল-আমীন মিশনের ধুলিয়ান
শাখার ক্লাস নাইনে পড়ছে। হাসিবাতুনের ছোটো বোনের বয়স বছর দশ।
ক্লাস ফোর পড়ছে সে।

হাসিবাতুন কেবল নিউ পরীক্ষায় নয়, উচ্চ-মাধ্যমিকেও দাবুণ কল
করেছিল। ৯৬.৬ শতাংশ নম্বর পেয়ে রাজ্যের কয়েক লাখ পরীক্ষার্থীর
মধ্যে ১৫তম স্থান পেয়েছিল। দিদির পড়াশোনা দেখে এবং তার
পরামর্শ মেনে ক্লাস ইন্সট্রেন থেকেই নিউ ফোকাস করে পড়াশোনা
শুরু করে। বর্তমান টাউন শাখার নিটের পত্নিত্ব জন্যে আলাদা করে
ক্লাস করার সুযোগ না থাকলেও নিউ ফোকাস করেই উচ্চ-মাধ্যমিকের
ক্লাস করানো হয় মিশনের সব শাখায়। মিশনে বা বাড়িতে যেখানেই
থাকুক, স্যাবের পরামর্শ মেনে প্রতিদিন নিয়ম করে অন্তত কুড়িটা
এমসিকিউ কোশ্চেন সলভ করা থ্যাকটিস করেছে। রনিং ইয়ারের
মেডিকেল পড়ার স্বপ্ন অবশ্য পূরণ হয়নি তার। ৪৯০ নম্বর পায়,
যেখানে কট-অব-মার্কস এসে দাঁড়ায় ৫০৫। এরপর পুরোপুরি নিটের
পত্নিত্ব জন্যে উলুবেড়িয়া শাখায় আসে। আগে সিলেবাস শেষ করে
রাখার এ-বার শুধু টেস্ট দেওয়া আর ভুল কমানোর লক্ষ্যে পত্নিত্ব
এগিয়ে নিয়ে যায়। লক্ষ্য স্থির রেখে পরিশ্রম করলে তা যে ব্যর্থ হয়
না, সেটা নতুন করে আবার প্রমাণ করল হাসিবাতুন। ■

সেক ওলিউল্লাহ

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১১৫৩৮

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

রমজান আলি এমরয়ডারির কাজ করেন। তিনি মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ। তাঁর দ্বী আয়েশা বিবি ঘরের

দক্ষ পরিচালক।

তাঁর পড়াশোনা ঋত

শ্রেণি পর্যন্ত। পূর্ব

মেদিনীপুর জেলার

কোলাঘাট থানার

নামালবাড় থামের

এটি এক শ্রমজীবী

প্রান্তিক পরিবার।

তিন সন্তানের মধ্যে

বড়ো রওশনারা

খাতুন। বাকি দু-জন



সেক আবদুল্লাহ ও সেক ওলিউল্লাহ। এক যুগ আগে এলাকার এক চাষের দোকানের আড্ডার আল-আমীন মিশন ও সেখানকার পড়ুয়াদের ভালো রেজাল্টের কথা শুনেছিলেন রমজান আলি। সেই থেকেই তাঁরও হচ্ছে জন্মায় ছেলে-মেয়েদের মিশনে পড়াবার। তিন জনের মধ্যে আবদুল্লাহ প্রথমে, পরে রওশনারা এবং ওলিউল্লাহ শেষে মিশনে প্রবেশ করে।

ঋত শ্রেণিতে মিশনের মেদিনীপুর শাখার ভর্তি হয় ওলিউল্লাহ। এই শাখা থেকে ২০২৪-এ মাধ্যমিক পরীক্ষার ৯৩.৭ শতাংশ এবং খলতপুর শাখা থেকে ২০২৬-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে ৪৮৪ নম্বর পেয়ে দিদি ও দাদার উচ্চ-মাধ্যমিকের রেকর্ডকে ছাপিয়ে যায়। স্বভাবতই খলতপুরের টি-৪০ থ্রুপ থাকা ওলিউল্লাহ বনিং বর্ষেই নিট পরীক্ষার ৫৯৫ নম্বর পেয়ে পরিবারের প্রত্যাশা পূরণ করে ফেলে। তার সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১১৫৩৮।

২০ | সাক্ষ্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬

ওলিউল্লাহ বলে, আববা-মা ও দাদা-দিদি সবসময়ই খুশি। নিউরোলজি নিয়ে মাস্টার্স করার ইচ্ছে আছে ওলিউল্লাহর। মিশনের পড়াশোনার পরিবেশ, সেক্রেটারি স্যার ও মারুফ আজম স্যারের মোটিভেশন সাক্ষ্যের অন্যতম কারণ বলে জানান। ওলিউল্লাহর কথা— মিশন, বিশেষ করে খলতপুরে একাদশ শ্রেণি থেকেই নিটের প্রভুতি চলে। নিট পরীক্ষার প্রথমপত্রের ধারণা আগেভাগেই হয়ে যায়। ফলে সাক্ষ্য পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি।

নামালবাড় থামেইতোমধ্যেই চারজন মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ছেন। তাঁর মধ্যে ওলিউল্লাহদের বাড়িরই দু-জন, অর্থাৎ তার দিদি ও দাদা এঁদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রওশনারা খাতুন বারাসাত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে এবং সেক আবদুল্লাহ কল্যাণী এইমসে এম.বি.বি.এস.-এর দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া। খলতপুর শাখার ছাত্রী রওশনারা ২০২০-তে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার ৯১ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। বরনাকালের বিভূক্ষার বছর তিনেক পরে গজারামপুর ক্যাম্পাস থেকে ২০২৪-এ নিটে সফল হয়েছিলেন। তাঁর সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ছিল ২৬৯৭৬। আবদুল্লাহ ২০২১-এ মাধ্যমিকে ৯৬ শতাংশ এবং ২০২৩-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯০.২ শতাংশ নম্বর নিয়ে মেদিনীপুর শাখা থেকে পাস করেন। খলতপুর শাখা থেকে ২০২৪-এ নিটে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৬৯০ নম্বর পেয়ে তার লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

তার ইচ্ছে থামে নিয়মিত হেলথ ক্যাম্প করে দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা ও ওষুধ প্রদান। আল-আমীনের গুরুত্ব নিয়ে তার মত, “মিশন আমাকে জীবনে ঠিক পথ দেখিয়েছে এবং কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে শিখিয়েছে। আমি মিশনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।”

ছেলে-মেয়েদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে রমজান আলি পৌঁছে গিয়েছিলেন মিশনের সেক্রেটারি স্যারের কাছে। সেক্রেটারি স্যার খুবই কম বেতনে ভাই-বোনকে পর পর ভর্তির সুযোগ করে দেন। ২০২৪ সালেই তাঁদের দুই সন্তান ডাক্তার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ২০২৬-এ সেই তালিকার আরও একজন জুড়ে গেল। নামালবাড় থামের সংখ্যালঘু সমাজে অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেছে এই নিম্নবিত্ত পরিবার। পরিবারের কর্তা সেক রমজান আলি ও কন্বী আয়েশা বিবি আল-আমীনের প্রতি কৃতজ্ঞ। ■

রামিয়া সিদ্দিকা

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১২১৫৯

মেডিকেল কলেজ, কলকাতা

“স্বামী বিবেকানন্দের
আদর্শ ও বাণী আজও
শিক্ষার্থীদের জ্ঞান
অর্জন, আত্মবিশ্বাস
এবং জীবনে
সফল হওয়ার
জন্যে অনুপ্রেরণা
জোগায়।” অন্যতম
প্রিয় বাঙালি মনীষী
স্বামী বিবেকানন্দকে
নিষে একটি রামিয়া



সিদ্দিকার ভাবনার অংশ। রামিয়া রাজ্যের অন্যতম সেবা মেডিকেল
কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়তে সদ্য ভর্তি হয়েছে। রামিয়ার বসতবাড়ি
মালদা জেলার রতুয়া থানার বৈকুণ্ঠপুর গ্রামে। বাবা মহম্মদ সায়েদ আলি
উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। পেশা ব্যবসা। মা রেহেনা খাতুন মাধ্যমিক-উত্তীর্ণ।
গৃহকর্ত্রী। দুই ছেলে ও দুই মেয়ের সংসার তাঁদের। রামিয়া কনিষ্ঠা।

সে মালদা রেলওয়ে গার্লস হাই স্কুল থেকে ২০২২-এ মাধ্যমিক পরীক্ষা
দেয়। রামিয়া পায় মোট ৬৩৫ নম্বর। এই পর্বে পরিবারিক সিদ্ধান্ত হয়
রামিয়াকে আল-আমীন ভর্তি করা হবে। রামিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস
করে মিশনের সাতরাগছি ব্রাঞ্চে ক্লাস ইন্ট্রোডাক্টর পড়াশোনা শুরু করে।
২০২৪-এ এই শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বিজ্ঞান বিভাগে তার
প্রাপ্ত নম্বর ৯২.২০ শতাংশ, যেটি তার মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের
থেকে প্রায় ২ শতাংশ বেশি। মিশনের বিজ্ঞান বিভাগের অধিকাংশ পড়ুয়া
উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার বছরেই ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল পড়ুতি প্রবেশিকা

পরীক্ষায় বসে থাকে। রামিয়াও নিট (ইউজি) পরীক্ষায় বসে এবং ফল
বেরোলে দেখা যায় সে পেয়েছে অনেকটাই আশানুরূপ নম্বর— ৪৪৩। এতে
উৎসাহী হয়ে নিটের নিবিড় প্রভুতির জন্যে ভর্তি হয় মিশনেরই অঙ্কুরহাটি
শাখায়। ২০২৫-এ ৪৪৭ নম্বর পেলেও সেটি কাট-অব-মার্কস থেকে
অনেকটাই দূরে রয়ে যায়। এতে রামিয়া কিছুটা বিস্ময় হলেও তার আবখা-মা
ও সহপাঠীদের কথায় পুনরায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। প্রতিজ্ঞা করে ২০২৬
সালে কাট-অব-মার্কসকে কেবল ছোঁয়া নয়, সেটিকে অতিক্রম করতে হবে।

গতবছরের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এনসিইআরটির টেক্সটকে
বার বার রিভাইজ করে হৃদয়ঙ্গম করতে থাকে। সঙ্গে বিগত বছরগুলির
প্রশ্নের নির্ভুল অনুশীলন এবং সময় বেঁধে মক-টেস্টে উত্তরোত্তর ভালো ফল
করতে থাকে রামিয়া। ২০২৬-এর নিটের রেজাল্ট প্রকাশিত হলে, রামিয়া
সত্যি-সত্যি কাট-অব-মার্কসকে অতিক্রম করে খুবই ভালো ফল করেছে।
তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৯৪ এবং সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১২১৫৯। স্বভাবতই সায়েদ
আলি ও রেহেনা খাতুনের উঠানে উৎসাহী আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীরা
ভিড় জমায়। তাঁরা তাঁদের স্নেহের রামিয়াকে মবারকবাদ জানাতে হজির।
মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যে খুশির উৎসব এই পরিবারে এর
আগেও ঘটেছে। পরিবারের বড়ো ছেলে ডা. সাদিকুলের ঘরনিও চিকিৎসক,
আল-আমীনের প্রাক্তনী ডা. সুমাইয়া আজিজা। পরিবারের আরেক সন্তান
সারাকাত রেজা বি.ফার্ম. পাস। তিনি ওষুধের দোকান করেছেন। রামিয়ার
দিদি স্নাতক রেজিনা সুলতানা বিবাহিতা।

রামিয়া এম.বি.বি.এস.-এর পর একজন দক্ষ গাইনোকোলজিস্ট হতে
আগ্রহী। কারণ তাঁদের এলাকায় মহিলাদের জন্যে এটি বিশেষ জরুরি। নানা
রকমের ছবি আঁকার পটু রামিয়ার ভবিষ্যতের পরিকল্পনা হল সশ্রমী মূল্যের
চিকিৎসা পরিক্ষা, প্রাথমিক ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য-সচেতনতা ও শিক্ষার প্রসার।
রামিয়া জানায়, তাঁদের এলাকার মানুষেরা বিশ্বাস করে শিক্ষার উন্নতিতে
আল-আমীনের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এ ছাড়া আল-আমীন বিষয়ে তার
নিজস্ব অভিমত হল, “মিশন শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে পড়াশোনার উপযোগী
যে-পরিবেশ দিয়ে থাকে, সেটি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে অতি উপকারী।” ■

সেখ তাহামিদ আজাদ

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১২৩৪৮

এন আর এস মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

রানিং ইয়ারে, অর্থাৎ
দ্বাদশ শ্রেণিতে
পড়ার সাথে-সাথেই
প্রথম প্রচেষ্টায় নিউ
জ্যাক করা অসম্ভব
না হলেও, খুব কম
সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীই
এই সাফল্য অর্জন
করে থাকে। এক্ষেত্রে
দ্বাদশ শ্রেণির
সিলেবাসভিত্তিক
পড়াশোনা এবং নিউের



প্রভুতির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। খলতপুর ক্যাম্পাসের যে ক-জন
ছাত্র-ছাত্রী এই আপাত কঠিন কাজটি করে ফেলেছে, তাহামিদ তাদেরই
একজন। তাহামিদ জানায়, “খলতপুর টি-৪০ ব্যাচে উচ্চ-মাধ্যমিকের
পড়াশোনার পাশাপাশি নিউের প্রভুতির সুযোগ রয়েছে। তা ছাড়া এখানকার
ক্যাকটি ও ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে নিউে সাফল্যের বিষয়ে প্রভূত সহায়তা
করেছে।” সে আরও বলে, তার আববা-মা ও তার নিজের খুব ইচ্ছে ছিল রানিং
বোর্ডে নিউে জ্যাক করা। এতে তার পরিবারের সঙ্গে সে নিজেও ভীষণ খুশি।
তাদের খুশির আরও এক কারণ এর আগে তাদের প্রামের কোনো ছাত্র-ছাত্রী
নিউে (ইউজি)-তে সফল হয়ে সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.
পড়ার ছাড়পত্র পায়নি। তাহামিদের সঙ্গে তার এক দিদি আকিয়া আজাদও
এ-বছর নিউে সফল হয়েছে। অর্থাৎ একই পরিবারের দিদি ও ভাই ওই প্রামের
মেডিকেল কলেজে প্রবেশের গৌরবের প্রথম অংশীদার।

২২ | সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬

হাওড়া জেলার বাগানান রুকের বাঙালপুর জনপদে জোকা ভুখন্ডের
আজাদ পরিবারে তাই খুশির উৎসব। পাড়াপড়শিরাও সেই আয়োজনে
সমিল। তাঁদের এলাকার গৌরব বৃদ্ধিকারীদের অভিনন্দন জানাতে
উপস্থিত। তাহামিদের আববা সেখ আবুল কালাম আজাদ সরকারি
কর্মচারী ছিলেন। এখন অবসরপ্রাপ্ত। মা নাহিদা আজাদ গৃহকর্তা।
আকিয়া ছাড়া আরেক দিদি আকিদা আজাদও নিউে বসেছিল। তার প্রাপ্ত
নম্বর ৪৪৪। প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে সরকারি কেটার অকিদার
ভর্তির সম্ভাবনাও প্রবল। সেটি হলে পরিবারের তিন সন্তানই মেডিকেল
প্রবেশনে থাকবে।

ফুটবল খেলতে এবং ফুটবল খেলা দেখতে খুবই পছন্দ হলেও তার প্রিয়
খেলোয়াড় ক্রিকেটার রেহিত শর্মা। নেতাজী, ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এপিজে
আবদুল কালাম প্রমুখ তার অন্যতম প্রিয় ভারতীয় ব্যক্তিত্ব। তাহামিদ স্বপ্ন
দেখে এম.বি.বি.এস. ডিগ্রি অর্জনের পর কর্তিরোলজি নিয়ে উচ্চশিক্ষার।
দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষের পাশে থাকার ইচ্ছে তার। তাঁদের পারিবারিক
আদর্শে এই উদারতা লক্ষ করা যায়। সে চিকিৎসা পরিষেবারও সেই
পারিবারিক ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সাফল্যে আল-আমীনের
ভূমিকা প্রসঙ্গে সে জানায়, মিশনে থাকায় তার সাফল্যের পথ অনেকটাই
সহজ হয়েছে। মিশনে সমস্ত শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে বিভিন্ন টেস্টে
বার বার বসতে পারা কনফিডেন্স বাড়ানোর সহায়ক হয়েছে। এ ছাড়া
পড়াশোনার আদর্শ পরিবেশ তো আছেই।

প্রামেই শুরু হয়েছিল তার প্রাথমিক শিক্ষা। এর পর প্রবেশিকা
পরীক্ষা পাস করে পঞ্চম শ্রেণিতে খলতপুর শাখায় অবস্থান। ২০২৪
সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তার অর্জন ৯৩ শতাংশ নম্বর। ২০২৬-এ
উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সে পেয়েছে মোট ৪৭৫ নম্বর, অর্থাৎ ৯৫
শতাংশ। ৫৯৩ নম্বর পেয়ে নিউে সফল হয়ে অর্জন করেছে এম.বি.বি.এস.
পড়ার ছাড়পত্র। কী কারণে মিশনে ভর্তি হয়েছিলো, জিজ্ঞাসা করায়
তাহামিদ জবাবে জানায়, “আমার দিদিরা আগে পড়ত মিশনে। তাদের
সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে মিশনকে আমার খুবই ভালো লাগত।” ■

প্রিয়াঙ্কা খাতুন

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১৩৬৭৩

আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

আন্তারজা মন্ডিক। শ্রমজীবী মানুষ। নিরাকর। পেশায় দক্ষ রাজমিস্ত্রি। কাজপাগল এই মানুষটি সারাবছর কর্মেই লেগে থাকেন। সাধারণ পরিসরে আন্তারজা শব্দটির অর্থ অজানা। তবে উর্দু বা হিন্দিতে আন্তর শব্দের অর্থ আতর। এর সঙ্গে বাংলার অজাজুড়ে দিলে হয়ে যায় আন্তারজা, অর্থাৎ সুগন্ধিত



শরীর। খোঁজ করে জানা গেল, উত্তরপ্রদেশের লখনউ শহরে করিগরি বা ঐতিহ্যবাহী উপায়ে প্রস্তুত আতরের এক শতাব্দী প্রাচীন ব্যারসরিক প্রতিষ্ঠান Attarang বিদ্যমান। আন্তারজোর সহধর্মিণী হালিমা বিবি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছেন। গৃহ সামলাতে তিনি বেশ দক্ষ। তাঁদের বাড়ি বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানার সুন্দরপুর থামে। তাঁদের দুই সন্তান প্রিয়াঙ্কা ও রাহুল। দু-জনই মেধাবী।

দু-জনেরই পড়াশোনা শুরুর স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সেই সময়ই তারা তাদের মেধার পরিচয় দিতে শুরু করে। প্রিয়াঙ্কা ২০২০ সালে সিহড় অরব মিত্র হাই স্কুল থেকে ৮৯ শতাংশ মার্কস নিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে। ভর্তি হয় রসুলপুর হাই মাদ্রাসা (উ. মা.)-র বিজ্ঞান বিভাগে। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায়

পায় ৯৪.৭ শতাংশ নম্বর। পরিবারিক আর্থিক দুর্বলতার দোটানায় মধ্যেও আববা-মা মেয়ের উচ্চশিক্ষক সামনে রেখে নিটের প্রত্নুতির জন্যে মিশনের বাবুইপুর শাখায় ২০২৩-এ ভর্তি করেন। তবে প্রত্নুতি আশানুরূপ না হওয়ার নিট পরীক্ষার রেজাল্ট প্রিয়াঙ্কা কিছুটা হতাশ হয়। সে-জন্যে পনের বছর বাড়িতে থেকেই প্রত্নুতি নিয়ে ৫৪০ নম্বর পায়। তবে নাছোড়বান্দা প্রিয়াঙ্কা মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায় কেচিং নিতে আববা ভর্তি হয়। ২০২৫-এ বর্ধমান ডেন্টাল কলেজে বি.ডি.এস.-এ ভর্তি হয় ৪৯১ নম্বর পেয়ে। প্রাপিত প্রিয়াঙ্কা এই রেজাল্টের এনর্জিতে এম.বি.বি.এস.-এ সাকল্যের সূত্রের সম্বান পেয়ে যায়। উলুবেড়িয়া থেকে চলে আসে তুলনার ছোটো শাখা অজুবহটিতে। তার বন্ধুদের কাছে শুনেনে অজুবহটি সেন্সর-স্টাডির আদর্শ জায়গা। কলস্বরূপ পি.টি. ও মক-টেস্টে উজ্জবাস্তর মার্কসের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে। রেজাল্ট প্রকাশিত হলে দেখা যায় গতবারের ৪৯১ নম্বরকে ছাপিয়ে এ-বারের প্রাপ্ত নম্বর হয় ৫৯০। কলে প্রিয়াঙ্কা পেঁছে যায় কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়তে। দিদির থেকে এক বছর আগেই নিটে সফল তার একমাত্র ভাই রাহুল মন্ডিকও মিশনের প্রাঙ্গনী। ২০২৩-এ বর্ধমান শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করার পর সে নিটের কেচিং নের খলতপুর শাখায়। ২০২৪-এ ৬৩০ নম্বর পেয়েও মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ পায়নি। এতে দমে না গিয়ে নতুন উদ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে নিজেই দক্ষ করে তোলে। ২০২৫-এ নিটের রেজাল্টে তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৫১৬। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে শুরুর করে তার স্বপ্নের এম.বি.বি.এস. পড়া।

২০২৫ ও ২০২৬ পর পর দু-বছর ভাই ও দিদির এম.বি.বি.এস.-এ ভর্তির পরীক্ষায় সাকল্যের খবরে সুন্দরপুর থাম আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীরা প্রিয়াঙ্কাকে অভিনন্দন জানায়। সুন্দরপুর থামের প্রথম মহিলা হবু ডাক্তার হওয়ার গৌরব অর্জন করল আববা-মায়ের গর্বের প্রিয়াঙ্কা। এম.বি.বি.এস. প্রবেশিকা পরীক্ষায় গতবছরের সফল রাহুল ওই থামের দ্বিতীয় ছাত্র। ■

সোহানা পারভিন

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১৫৪৯৩

ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

সাইকেল রিপেয়ারের ছোটো এক দোকান চালান মহম্মদ সফিকুল ইসলাম। পড়াশোনা করেছেন অট ক্লাস। কৃষিজমির পরিমাণ মাত্র ৫ কাঠার মতো। সহধর্মিণী সামীমা ইয়াসমিন মাধ্যমিক পাস। ঘরের কাজকর্ম করার অবসরে এলাকার কয়েক জন বাচ্চাকে টিউশন পড়ান। চার কন্যাসন্তান তাঁদের।



সবচেয়ে ছোটো সাবনুর চতুর্থ শ্রেণিতে একটি কে. জি. স্কুলে পড়ে। মেজো সাদিয়া ও সেজো সাবরিন যথাক্রমে দ্বাদশ ও নবম শ্রেণির ছাত্রী। একটি বেসরকারি মিশনের হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করে। নিম্ন-মাধ্যমিক এই পরিবারের বসবাস উত্তর চব্বিশ পরগনার হাড়েয়া থানার খাড়ুপালা গ্রামে।

ঘরের বড়োসন্তান সোহানা। স্থানীয় প্রাইমারি স্কুলেই তার মেধার পরিচয় ধরা পড়ে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি শালিপুর হাই স্কুলে পড়ার পর সপ্তম শ্রেণিতে একটি আবাসিক মিশনে ভর্তি হয়। ওখান থেকে ২০২২ ও ২০২৪-এ মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার যথাক্রমে ৯১.২৮ ও ৯০.৪ শতাংশ নম্বরের ভালো রেজাল্ট করে। বাড়ির সবাই আনন্দিত হয়। সোহানার ছোটোবেলার স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়ার। বন্ধুদের মুখে শুনছে

২৪ | সাক্ষরতার আলোকবর্তিকা ২০২৬

আল-আমীনে কোচিং নিলে ডাক্তারিও প্রবেশিকা পরীক্ষার পাস করা হয় সহজ। এলাকার মানুষও বিশ্বাস করে আল-আমীনে পড়লে এবং নিজে পরিশ্রম করলে ডাক্তার হওয়া সম্ভব। তাদের সামান্য পারিবারিক ইনকামে মিশনে ভর্তির ও থাকার খরচ বহন করতে পারবে কি না, এই নিয়ে মনের মধ্যে ছিল সংশয়। প্রবেশিকা পরীক্ষার পাস করে আরও উৎসাহী হয়ে ওঠে সোহানা। এদিকে তার আববা মিশন-কর্তৃপক্ষের সামনে নিজেদের আর্থিক অবস্থা জানিয়ে মাসিক বেতন মিনিমাম করার আবেদন করেন। সোহানা ও তার পরিবারের মুখে হাসি ফোটে। কারণ মিশনের তরফে মাসিক বেতন ধার্য করা হয়েছে নির্ধারিত মাসিক বেতনের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। সোহানা বাবুই পুর হস্টেলে পৌঁছে বার নিটের প্রতীতির জন্যে।

দক্ষ ক্যাকলিটি, নিভৃতে সেন্স-স্টাডির প্রশস্ত পরিসর, সজো খাওয়া থাকা পড়া সবকিছুই একই ছাদের তলায়। তাদের দেখাশোনার জন্যে আছে সংবেদনশীল স্টাফ ও ম্যাডাম। সোহানা এই পরিবেশে নিজেকে মনিষ্যে নিয়ে নিজের লক্ষ্য অর্জন করতে পরিশ্রমে খামতি রাখে না। ২০২৫-এ নিটের পরীক্ষায় ৪১৭ নম্বর পেয়ে কটি-অব-মার্কস থেকে সে অনেকটাই পেছনে রয়ে যায়। আশাভাঙ্গা হওয়ার ফলে ভেঙে পড়ে সোহানা। তবে তার আববা-মা, রাজীব স্যার এবং বিশেষ করে বুশিয়া ম্যাম আরেক বার চেষ্টার জন্যে উৎসাহিত করেন। সোহানা পুনরায় নিট ক্ল্যাক করার সংকল্পে ২৪ ঘণ্টার ৫-৬ ঘণ্টা বাদে পুরো সময় পড়াশোনার ব্যয় করতে শুরু করে। ২০২৬-এর নিটের রেজাল্ট বের হলে দেখা যায় সে ৫৮৫ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক করেছে ১৫৪৯৩। আববা-মা থেকে আত্মীয়স্বজন সকলেই বেজায় খুশি। সবায় মুখে একটাই কথা এমন একটা দিন দেখতে পাব ভারতেই পরিণি। কারণ থার সমান সমান হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত খাড়ুপালা গ্রামের প্রথম সন্তান যে এম.বি.বি.এস. চিকিৎসক হতে যাচ্ছে।

সোহানা জানায়, উচ্চ-মাধ্যমিক পর্যন্ত নিট নিয়ে তার সেরকম কোনো ধারণা ছিল না। যদিও রানিং ইয়ারের নিটে সে পেয়েছিল ২৯১ নম্বর। তার ইচ্ছে এম.বি.বি.এস.-এর পরে কর্ডিওলজি নিয়ে উচ্চশিক্ষার। ■

বুকসার খাতুন

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ১৫৭৬৯

আর জি কর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

“একটা মেয়ে ডাক্তার হলে শুধু সে ডাক্তার হয় না, তার সাথে তার পরিবার ও সমাজও সুস্থ হয়ে ওঠে।” সামান্য এই কয়েকটি কথায় সামাজিক অবস্থানের নিখুঁত বর্ণনা করল প্রত্যন্ত গ্রামের এক তরুণী বুকসার। ফারসি, উর্দু শব্দ বুকসারের অন্যতম অর্থ জ্যোতির্ময়। জ্যোতির্ময়ী বুকসার সম্প্রতি আন্ডার-



থ্যাজুয়েট নিট পরীক্ষায় যথেষ্ট ভালো ব্যাঙ্ক করে এম.বি.বি.এস. পড়ার যোগ্যতা অর্জন করে ফেলেছে। বুকসারের দিদি বুনা খাতুন হুগলি জেলার মিশনের বাবনান শাখায় অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। বাবনান শাখা থেকে মাধ্যমিক ও পাণ্ডুরা শাখা থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে। এখন মজলগিরির এইমসে বি.এসসি. (নার্সিং) পড়াছেন। দিদির পথ ধরেই বুকসারও বাবনান শাখায় সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। তাদের আববা সেক রহিম আলি একজন দর্জি। সামান্য আর তাঁর। পড়াশোনা থাইমারি স্কুলেই শেষ। তার ত্রী বুফিনা খাতুন বিবি মাধ্যমিক পাস। তিনি আইসিডিএসের অজানওয়াড়ি-কর্মী। জমিজায়গাও খুব বেশি নেই। আর্থিক দিক থেকে নিম্নবিত্ত।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর থানার প্রান্তিক এলাকা নোনা

নন্দরপুর গ্রামে বাড়ি। কাছাকাছি সববেড়িয়া গ্রামের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা. হিবজুল আলি খান আল-আমীনের প্রান্তনী। বর্তমানে তিনি সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অর্থোপেডিক্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। তাঁর বাবার সঙ্গেই রহিম আলির মোলাকাতই মিশনে মেয়েদের ভর্তিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল অর্থ। মিশনের সেক্রেটারি স্যারের সহৃদয় সহযোগিতা মিশনে মেয়েদের ভর্তিকে অনেকটাই সহজ করে। মাসিক বেতন ও ভর্তির সময়ের এককালীন অর্থে বড়ো বকমের ছাড় পেয়ে যায় তারা।

বেসরকারি বিদ্যাসাগর মডেল স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির পর গোপীমোহনবাড় গার্লস হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে বুকসার। মিশনে তার লেখাপড়ার শুরুর বাবনান শাখায়, সপ্তম শ্রেণিতে। ২০২১-এ মাধ্যমিকে ৯৭.১৪ শতাংশ নম্বর পায় এই শাখা থেকে। মেদিনীপুর শাখা থেকে ৯১.২ শতাংশ নম্বর পেয়ে উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা পাস করে ২০২৩-এ। মিশনের এক অংশ পড়ুরা উচ্চ-মাধ্যমিকের পর নিটের সাকল্যের মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক হয়। বুকসারও সেই পথের পথিক।

রানিং বর্ষে নিটে খুব-একটা ভালো নম্বর না পেলেও, খলতপুরে প্রথম বছর ২০২৪-এ ৫৭৬ নম্বর পেয়ে ‘আমি পারব’ তার এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়। ২০২৫-এ পায় ৪৮৯ নম্বর। পর পর দু-বছর সাফল্য থেকে একটু দূরে থাকায় বুকসার চাপে পড়ে। হস্টেলের সহপাঠী ও আববা-মায়ের অভয়ে আবার পুরোদমে পড়াশোনার মেতে ওঠে। নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষার সঙ্গে থুপ-স্টাডিং মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকে। পরিশ্রম ও চেষ্টার সম্মিলনে ২০২৬-এ ৫৮৫ নম্বর পেয়ে বুকসার ডা. বুকসার খাতুন হওয়ার প্রথম ধাপ মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়ার ছাড়পত্র পেয়ে যায়। বুকসার জানায়, প্রত্যেক দিন পরিকল্পনামাফিক পড়া এবং আপাত কম নম্বর পাওয়ার ভয় না পেয়ে পরিশ্রমের সঙ্গে ধৈর্য আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে প্রত্যেকটি ভুলের কারণ বিশ্লেষণ করে ঠিক করে নেওয়ার মাধ্যমেই সাফল্য আসবে ইনশা আল্লাহ। ■

মইনুল হাসান

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ২৭০১৪

আই পি জি এম ই আর অ্যান্ড এস এস কে এম হসপিটাল

১৬ জুলাই ২০২৬। নিট (ইউজি)-এর ফল প্রকাশের দিন। মুর্শিদাবাদ জেলার খড়খাম থানার সাদল গ্রামের এক মহিলার দু-চোখ বেয়ে অনবরত অশ্রু গড়িয়ে যাচ্ছে। পাশে তার ছোটোছলে মইনুল। পড়াশিরা মহিলারাও জড়ো হয়েছেন। অথচ আজ তাঁর বড়োই আনন্দের দিন। আদরের ছোটো ছলে মইনুল নিট



পরীক্ষার দাবী সাফল্য পেয়েছে। ডাক্তারি পড়ার ছাড়পত্র পেয়েছে। আসলে প্রায় এক মাস আগে যে-দিন নিট পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল মইনুল, সে-দিনই তাঁর আববা সেকেন্দার সেখ ইন্তেকাল করেন। পরীক্ষা চলাকালীন তাকে জানাতো হয়নি। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে এসে মইনুল দেখে অনেক মানুষ জড়ো হয়েছেন, তাঁর মা তুনজেলা বিবি তাকে দেখেই ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। সেই বিবাদ আজকে সন্তানকে আহ্বান করার কথাও ভুলিয়ে দিচ্ছে। শুধুই বার বার উচ্চারণ করছেন, “যদি তোর আববা বেঁচে থাকতেন তাহলে কতই-না খুশি হতেন।”

মইনুলের আববার ক্রাস এইট পর্যন্ত পড়াশোনা। তাঁদের বিয়ে তিনেক জমিতে চাষাবাদ করেই করতেন সংসার নির্বাহ। তিনি জানতেনই না নিট কী জিনিস। নিজে খুব বেশি লেখাপড়া না করতে পারলেও ইচ্ছে ২৬ | সাক্ষ্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬

ছিল ছেলেকে ডাক্তার করতে হবে। এক ছেলেকে পুলিশ অফিসারও করেছেন। মইনুলের দাদা সম্রাট সেখ গণিতে সামান্যিক স্নাতক। তিনি পুলিশের এএসআই। মইনুলের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তি গড়া হয় সাদল ২ নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। খুব মেধাবী না হলেও ওই সময় তার রোল নম্বর ১ থেকে ৫-এর মধ্যে থাকত। কেরানাকালীন সময়ে ২০২২-এ মাধ্যমিক পরীক্ষার তার প্রাপ্ত নম্বর ৬৫.২৮ শতাংশ। মইনুলের আববা-মা এই রেজাল্টে খুব-একটা খুশি হতে পারেননি। সে-কারণে তারা মনোযোগী হন মইনুলের পড়াশোনার প্রতি যত্নের এবং ভালো টিউশনেরও ব্যবস্থা করেন। উচ্চ-মাধ্যমিকে সাহাদিয়াড হাই মাদ্রাসা (উ. মা.) থেকে ৮৮.২ শতাংশ নম্বর নিয়ে ২০২৪-এ পাস করে মইনুল।

বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রায় প্রতিটি এলাকার এটি খুবই প্রচলিত যে, আল-আমীন পড়লে ডাক্তার হওয়া যায়। তাই অর্থিক বিভ্রম সত্ত্বেও মিশনে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মিশন-কর্তৃপক্ষ মাসিক বেতনে অর্ধেক ছাড় দিয়ে মইনুলকে গোলাবাড়ি শাখায় ভর্তি করে নেয়। ২০২৫-এ নিটে সে পায় ৪৬৯ নম্বর। ২০২৪-এ উচ্চ-মাধ্যমিকের সঙ্গে নিট পরীক্ষা দিয়ে মইনুল পেয়েছিল ২৬৮ নম্বর। আরও ভালো করে নিটের প্রভুত্ব জেনে মইনুল গোলাবাড়ি থেকে চলে আসে খলিশানি শাখায়। নিটের রেজাল্ট মইনুল ৫৬৪ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় ক্তরে ২৭০১৪ ব্যাঙ্ক করেছে। মইনুল জানায় এই ব্যাঙ্ক অন্য মেডিকেল কলেজে সুযোগ পেলেও মাকে দেখাশোনার প্রক্ষেপে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার ইচ্ছে ভবিষ্যতে মেডিসিনে এম.ডি. করার। তার আরও লক্ষ্য মানবিক ও দক্ষ চিকিৎসক হয়ে মানুষের সেবা করা। সাংসার্য কারণ কী জানাতে সে বলে, “আমার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, মিশনের সেক্রেটারি স্যারের অনুপ্রেরণা, খলিশানি শাখার স্যার ও অন্যান্য স্টাফ, বিশেষ করে সুপার স্যারের আত্মবিক দিকনির্দেশনা। আমার সকল বন্ধু ও সহপাঠীদের সহযোগিতা, উৎসাহ ও কঠিন সময়ে পাশে থাকা। আমার আত্মা, মরহুম আববা, দাদা, দিদি এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ভালোবাসা, ত্যাগ, দোওয়া ও নিরন্তর সমর্থন ছাড়া এই স্বপ্ন কখনোই পূরণ করা যেত না।” ■

আয়েশা জুলেখা খাতুন

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৩২৮৩৪

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপিটাল

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর এলাকার মাঞ্জুরিয়া গ্রামের এক সাধারণ পরিবারের সদস্যসংখ্যা মোট ৪ জন। স্বামী-স্ত্রী ও দুই কন্যা। নিজেদের বিধে খানেক জমিতে চাষাবাদ করে সাংসারিক দরিদ্র নির্বাহ করেন গৃহকর্তা জকিরুদ্দিন মল্লিক। স্ত্রী শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষিকা রিজিয়া খাতুন বিবি। উভয়েই



উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। সূখে-দুখে চলছিল তাঁদের এই ছোটো সংসার। ২০০৯-এ জোরালো মারণ স্ট্রোকে জকিরুদ্দিন মল্লিক হস্তেকাল করেন। দুই শিশুকন্যার বয়স তখন মাত্র আড়াই বছর। আয়েশা জুলেখা খাতুন ও আয়েশা সিদ্দিকা খাতুনদের দেখাশোনা ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের দরিদ্র একসঙ্গেই সামলাতে হয়। জুলেখা প্রাইমারি স্কুল পেরিয়ে ঘোষপুর শ্রীনেহরু হাই স্কুল পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ওই স্কুল থেকেই মাধ্যমিক পরীক্ষায় ২০২০-তে ৮-৭ শতাংশ নম্বর পায়। স্কুলের মধ্যে উজ্জ্বল ফল করে মাকে বলে সায়েল নিয়ে পড়বে। কোথায় পড়বে কীভাবে হবে সায়েল পড়া—এসব চিন্তার মধ্যে আল-আমীন মিশনের খবর পেয়ে, মেদিনীপুর শাখার সুপারিনটেনডেন্ট সেখ ইআফিল স্যারের শরণাপন্ন হন। জুলেখা ক্লাস ইন্ট্রোডেনে ভর্তি হয়। আর্থিক দিক বিবেচনা করে এবং মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট দেখে মাসিক

বেতন বেশ কম করা হয়েছিল। ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে ৯০.৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাস করে জুলেখা। উচ্চ-মাধ্যমিক পড়ার সময়ই জুলেখা মনে মনে স্থির করে সে ডাক্তারি পেশার বাবে। নিটের প্রত্নুতি নিতে ভর্তি হয় উল্লেখভিরা (সেনিহার) শাখায়। ২০২৩-এ নিটের স্কোর হয় ৩৭৯। পত্রের দু-বছর বাবুইপুর শাখা থেকে ২০২৪ ও ২০২৫-এ তার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৫৫৫ ও ৪৫৯। তিন বছর পরিশ্রমের পরও সাকল্য থেকে দূর থাকায় জুলেখা কিছুটা হলেও ভেঙে পড়ে।

জুলেখার একমাত্র বোন আয়েশা সিদ্দিকা খাতুন দিদির দেখাচোনা পাথেই লেখাপড়া করে। আয়েশা ২০২১-এ মাধ্যমিকে ৬২৪ এবং মেদিনীপুর ক্যাম্পাস থেকে ২০২৩-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে ৪২৬ নম্বর পায়। তারও জেদ নিটের কেচিং নেবে। অত্যা সেও চলে আসে মিশনের বাবুইপুর শাখায়। ২০২৪-এ আয়েশা সিদ্দিকা নিটে স্কোর করে ৫৩৩। পত্রের বছর ২০২৫-এ তার প্রাপ্ত নম্বর ৫০৪। অর্থাৎ সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪৮৩২১। সে হয়ে ওঠে পুন্ডুলিয়ার দেবেন মাহাতো সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। এই সাকল্যে তাদের মা খুশিতে কঁদে ফেলেন। তার দিদিও খুশি হয়। তবে জুলেখা আরও এক বছরের নিটের প্রত্নুতি নিতে চলে আসে মিশনের মহেশতলা শাখায়। পরিশ্রম ২০২৬-এ জুলেখাকে নিজের মেদিনীপুর শহরেই এম.বি.বি.এস. পড়ার সুযোগ করে দেয়। জুলেখার প্রাপ্ত নম্বর ৫৫৬ এবং সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৩২৮৩৪। এই খবর শুনে মায়ের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তার দুই মেয়েই এখন এম.বি.বি.এস.-এর শিক্ষার্থী। দু-জনই হবু চিকিৎসক। সবচেয়ে বড়ো কথা মাঞ্জুরিয়া গ্রামের প্রথম ও দ্বিতীয় হবু চিকিৎসক যথাক্রমে আয়েশা ও জুলেখা। জুলেখার ইচ্ছে ভবিষ্যতে পেডিয়াট্রিকে এম.ডি. করার।

জুলেখা জানায়, “আমাদের দুই বোনকে মানুষ করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও আমার মা হার মানেননি।” সে আরও বলে, “আল-আমীন মিশন সত্যিই আমাদের অনেক সাহায্য করেছে। খুবই কম বেতনে আমাদের পড়ার ব্যবস্থা করার আমবা পড়তে পেরেছিলাম। আমবা এ-জন্যে সেক্রেটারি স্যারের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।” ■

আকেয়া আজাদ

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৩৩৯০৩

ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল

“থামের সকলেই খুশি। কারণ থামের প্রথম ডাক্তার আমরা”— জনাব হাওড়া জেলার বাগনান থানার জোকা থামের আকেয়া আজাদ। ‘আমরা’ বলার কারণ তার ভাই সেখ তাহমিদ আজাদও নিউ ক্র্যাক করেছে। অর্থাৎ জোকা জনপদের প্রথম এম.বি.বি.এস. চিকিৎসক হওয়ার সৌভাগ্য একই পরিবারের দিদি ও ভাইয়ের। তারা উভয়েই সরকারি মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস.-এর প্রথম বর্ষের পড়ুয়া।



২০১৪ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে খলতপুর ক্যাম্পাসে মিশনের বেসিক্সার অভিযান শুরু করেছিল আকেয়া, সেটি গত ১৬ জুলাই ২০২৬ সালে শেষ হল অক্সফোর্ড ক্যাম্পাসে। ওই দিন নিউ (ইউজি)-এর রেজাল্ট প্রকাশিত হয়। মাঝে ২০২০-তে খলতপুর শাখা থেকে ৮৮ শতাংশ নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক এবং ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৯ শতাংশ নম্বর পায় বর্ধমানের মেমরি শাখা থেকে। এরপর শুরু করে আববা-মায়েব স্বপ্নকে সাকার করতে, অর্থাৎ দেশের অন্যতম কঠিন আন্ডার-গ্রাজুয়েট মেডিকেল প্রবেশিকা পরীক্ষায় সফল হতে। রানিং ইয়ারে আকেয়ার প্রাপ্ত মাত্র ৪৭ নম্বর থেকে ২০২৬-এ সে পৌঁছে গেল ৫৫৪ নম্বরে। অর্থাৎ ২৮ | সাক্ষর আলোকবর্ষিকা ২০২৬

২০২২-এ তার সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক যেখানে ছিল ১৩৬১০৫৯, ২০২৬-এ সেটি কমে দাঁড়াল ৩৩৯০৩-এ। মাঝের ২০২৩ ও ২০২৪ সালে অন্য প্রতিষ্ঠানে থাকার পর ২০২৫-এ মিশনের অক্সফোর্ড শাখায় ভর্তি হয়। আকেয়া তিন বছর নিটে কথাক্রমে ৩৩৮, ৪৯৬ ও ৪৬৮ নম্বর পেয়েছে।

বিনয়ের সঙ্গে সে স্বীকার করে নেয়, “আমি ছোটবেলা থেকে খুব-একটা ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম না। কিন্তু আববা-মাও হাল ছাড়িনি। নিটের জর্নিতে ক্যাম্পাসের ইন-চার্জদেরও ভূমিকা অনেক বেশি। কিবরিয়া স্যার, মহিউল স্যার এঁরা অনেক বেশি মোটিভেট করতেন।” আকেয়ার আববা সেখ আবুল কালাম আজাদ পোর্ট ট্রাস্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী এবং মানাহিদা আজাদ গৃহপরিচালক। তাঁরা কথাক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পাস। তার দিদি অকিদা আজাদও এ-বছরের নিউ পরীক্ষায় ৪৪৪ নম্বর পেয়েছে। ছোটবেলায় অসুস্থতাজনিত কারণে অকিদার এক বছর নষ্ট হয়ে যায়। সে-কারণে অকিদা ও আকেয়া একইসঙ্গে খলতপুরে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষা একই বছর দেয়। আল-আমীনে নিটের কেচিংও একসাথেই নিয়েছে।

নিটে সাফল্য পেয়ে আকেয়া দারুণ খুশি। কারণ সে মা-বাবার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছে। আকেয়া এম.বি.বি.এস. করার পর গাইনোকোলজি নিয়ে এম.ডি. বা এম.এস. করতে আগ্রহী। বিশেষ করে তার মা ও নানিমার দীর্ঘ দিনের স্বপ্ন এটি। মহানবি মহম্মদ (সা.)-এর শান্ত ও পরিশীলিত ব্যবহার এবং সকলের প্রতি সহানুভূতিশীল আচরণ আকেয়াকে খুবই অনুপ্রাণিত করে। মানুষের দুঃখ দুর্দশা তাকে খুবই বিহ্বল করে দেয়। মনে পুঁবে রেখেছে বহু গোপন ইচ্ছে ও কর্তব্য। গরিব মানুষ, বিশেষ করে রাজস্বাচারের অভাবী দুঃস্থ মানুষকে দেখে তার মনে খুবই কষ্ট হয়। আকেয়া তাঁদের জন্যে ভবিষ্যতে সাধ্যমতো পরিষেবা প্রদান করবে ইনশা আল্লাহ।

কিজিঙ্গ ও কেমিসিটু তো আছেই। আকেয়া জানায়, বায়োলজি তার প্রিয় বিষয়। নিটের বায়োলজিতে সে পেয়েছে ৩৫৫ নম্বর। তার মতে বায়োলজির চ্যাপটারগুলি বোঝার পরই মুখস্থ করা দরকার। ■

আয়েশা সিদ্দিকা

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৩৭৯৬২

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ভক্ত
আয়েশা গতবছর মাত্র
কয়েক নম্বরের জন্যে
এম.বি.বি.এস.-এ
ভর্তি হতে পারেনি।
ভর্তি হয়েছিল
বি.ডি.এস.-এ। প্রথমে
বর্ধমান কলেজ এবং
শেষে কলকাতার
আর আহমেদ ডেন্টাল
কলেজে। তবে
আয়েশার মন ছটফট
করত এম.বি.বি.এস.



পড়ার জন্যে। নিট ২০২৬-এর ফল বেব'হলে দেখা গেল বীরভূম জেলার
বোলপুরের যিদহ থামের আয়েশার সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক হয়েছে ৩৭৯৬২,
অর্থাৎ আয়েশার এম.বি.বি.এস. কোর্সে পড়ার স্বপ্ন পূর্ণ হল।

শিশু আয়েশা তখন এক বেসরকারি স্কুলের ছাত্রী। দুই মামা পড়ত
আল-আমীনে। ছুটিতে তাঁরা দিদির বাড়িতে এলে, আল-আমীনের
পড়াশোনা ও সাফল্যের সৌরভ ছড়িয়ে দিত। মামাদের মুখের এই ভালো
কথামনে গোঁথে বার আয়েশার। তারও ইচ্ছে হয় মিশনে পড়ার। কিন্তু বেশ
কিছু বাধার মধ্যে অন্যতম ছিল আর্থিক বাধা। আববাসেখ আলিম নিজেদের
বিষে কয়েক জমিনে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে সংসার চালাচ্ছেন। লড়াইয়ে
তিনি সাথে পেয়েছেন আয়েশার আত্মা আসবাবুদ্ধেশাকে। তাঁরা উভয়েই
মাধ্যমিক পাস। আয়েশা, আসিয়া ও আফসোনাকে নিয়ে তিন কন্যার

পরিবার তাঁদের। আসিয়া খাতুন মিশনের পাণ্ডুরা শাখা থেকে মাধ্যমিক
পরীক্ষার পাস করে। পাথরচাপুড়ি শাখা থেকে সে উচ্চ-মাধ্যমিকে রাজ্য
স্তরে ১৫-তম স্থান পায়। আসিয়া এখন আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী।
আফসোনা স্থানীয় শিক্ষালয়ে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

আয়েশা প্রবেশিকা পরীক্ষার পাস করলে তাকে নিয়ে খলতপুরে পৌঁছে
যান তার আববা। সেটি ২০১৫ সাল। সেফ্রেটারি স্যার অধিক অবস্থা
বিবেচনা করে মিনিমাম মাসিক বেতনে হুগলির বাবনান শাখার পঞ্চম
শ্রেণিতে ভর্তি করে নেন। ২০২১-এর মাধ্যমিক পরীক্ষার তার প্রাপ্ত নম্বর
৯৬.১৪ শতাংশ। ২০২৩-এ বর্ধমান শাখা থেকে মোট ৪৫১ নম্বর পেয়ে
উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে। এরপর খলতপুর শাখায় শুবু'হর আয়েশার নিটে
সাফল্যের স্বপ্নপূরণের দৌড়। রানিং ইয়ারে নিটে খুব-একটা ভালো নম্বর
না'পেলিও ২০২৪ ও ২০২৫-এ তার প্রাপ্ত নম্বর যথাক্রমে ৫৫১ ও ৪৯৬।
২০২৫-এ খুব কাছে গিয়েও এম.বি.বি.এস.-এ ভর্তি না'হতে পেরে মনঃকষ্টে
আয়েশা অজবুরহাটি শাখায় নতুন উদ্যমে শুরুর সংগ্রাম। সেই চেঁচটার কল
মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়তে ভর্তি হওয়া।

প্রত্যন্ত ও উচ্চশিক্ষার পিছিয়ে থাকা যিদহে আয়েশার সাফল্যে
পরিবার ছাড়া অন্যরাও খুশিতে আল-আমীনে সন্তানদের ভর্তি করার
আগ্রহী হয়ে উঠেছে। আয়েশা ওই থামের প্রথম এবং একমাত্র গৌরব
যে মেডিকেল কলেজে এম.বি.বি.এস. পড়তে যাচ্ছে। আয়েশার ইচ্ছে
ভবিষ্যতে স্ত্রী ও প্রসূতিবিদ্যায় এম.এস. ডিগ্রি অর্জন ছাড়াও এম.সিএইচ.
ও ডি.এম.-সহ উচ্চতর গবেষণার। তার প্রতিজ্ঞা ডাক্তার হিসেবে অসহায়
গরিব, এতিম, মিসকিনদের বিনামূল্যে বা মিনিমাম অর্থে চিকিৎসা
পরিষেবা প্রদানের। তার বিশ্বাস, যেকোনো ছাত্র-ছাত্রী যদি নির্ভর সজ্জা
লাগাতার পরিশ্রম করে ব্যর্থ তবে সে সাফল্য পাবে ইনশা আল্লাহ। তার
সাফল্যে মিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করার আয়েশা বলে, “আমি এবং
আমার পরিবার আল-আমীন মিশনের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ। খুবই কম বেতনে
পঞ্চম শ্রেণি থেকে নিট পর্যন্ত সাফল্যের এই যাত্রার মিশনের অবদান
অতুলনীয় ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।” ■

মহম্মদ সালমান সেখ

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪০৭১১

মালদা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল

“ক্লাস টুয়েলভে এসে মিশনের নিট ক্র্যাক করা দাদাদের কথা শুনতাম ও উদ্বেগ হতাম।

তারপর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম বানিং ইয়াবেই নিট ক্র্যাক করতে হবে। যখন মিশনে ছুটি থাকত তখন যেসব বিষয়ে দুর্বল ছিলাম সেগুলো অনলাইনে ক্লাস করে ভালো করে ফেলতাম।

সারাছুটিতে এভাবে

পুরো সিলেবাস রিকভার করতাম। মিশনের পরিবেশে এসে সেগুলোকে আরও গুছিয়ে নিতাম। এভাবেই ক্লাস টুয়েলভে পড়ার সময়ই নিটের সিলেবাস কমপ্লিট করে বেলেছিলাম।” উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার বর্ষেই নিটে সাফল্য পাওয়ার গোপন কথা এভাবেই প্রকাশ্যে এনেছে সালমান।

আল-আমীনের সূচনাপর্ব থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তির প্রস্তুতি নিয়েই একমাত্র বিবেচ্য। ব্যতিক্রম থাকে দুটো শ্রেণির জন্যে— পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃহীন পড়ুয়া কিংবা ইমাম ও মওলানা সাহেবের ছেলে-মেয়েব ক্ষেত্রে। ২০২৪ সালের এক ঘটনাও সে-কথাই প্রমাণ করে। বীরভূমের কীর্দাহার থানার নূরপুরের মাওলানা সেখ সেকেন্দার একটি খারিজি মাদ্রাসার শিক্ষক। তিনি চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ স্কুলে পড়ার পর ইসলামি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মাধ্যমিক পাস কীরহিমা বেগম ঘরের

৩০ | সাক্ষ্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬



পরিচালক। তাঁদের তিন পুত্র এবং এক কন্যা। বড়োছলে সেখ সাইদ উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে কলেজে পড়াকালে কাজে লেগে যায়। ছোটো সেখ সিরাজুদ্দিন থামের থাইমারিতে চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ার পাশাপাশি সঙ্গে বাবার মাদ্রাসার হিফজও করে। একমাত্র কন্যা নবম শ্রেণির ছাত্রী।

মেজোসন্তান মহম্মদ সালমান সেখ স্থানীয় থাইমারি স্কুলে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর স্থানীয় পথ্যাত কীর্দাহার শিবচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। এই স্কুলেই পড়াশোনা করেছেন ভারতের ১৩তম রাষ্ট্রপতি শ্রী বমুখোপাধ্যায় (১৯৩৫-২০২০)। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সালমান ৮৬.৫৭ শতাংশ নম্বর পায়। সালমানের পড়াশোনা নিয়ে অর্থিক প্রস্তুতি পরিবারিক সিদ্ধান্ত হয়ে ওঠে দোলাচলে ভরা। মিশনের প্রাক্তনী বর্তমানে মেডিকেল কলেজের ছাত্র আব্দুল নূর ব্যক্তিগতভাবে সচেষ্ট ছিলেন মেধাবী সালমান মিশনে ভর্তি হোক। আব্দুল নূর সেক্রেটারি স্যারের কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে তিনি সালমানকে ভর্তি করে নেন।

পাণ্ডিত্যে উচ্চ-মাধ্যমিকের সিলেবাসের সঙ্গে নিটের বিশেষ প্রভুতির সুযোগ ছিল না, সালমান কিন্তু নিটের সাফল্যকে লক্ষ্য করে পড়াশোনাকে সংগঠিত করে। কলঙ্করূপ উচ্চ-মাধ্যমিকে ভালো কলেবর সঙ্গে নিটেও সফল হয়ে এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে ওঠে। ২০২৬-এ উচ্চ-মাধ্যমিকে তার প্রাপ্ত নম্বর ৯০.৮ শতাংশ এবং নিটে সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪০৭১১।

মুহুর্তেই খবর চাউর হয়ে যায় মাওলানা সেকেন্দারের ছেলে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাস করেছে। সালমান ছাড়াও ওই শাখা থেকে আরও দু-জন ছাত্র বানিঙে নিটে সফল হয়েছে। সালমানের মনে পড়ছে, ভর্তির সময় সেক্রেটারি স্যার তার পিঠে হাত রেখে শুধু একটি কথাই বলেছিলেন, “কী ছেলে, পারবে তো?” নিটের রেজাল্ট বেরোলে আনন্দ ও ছোটোভাইকে সঙ্গে নিয়ে সালমান সেক্রেটারি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে এসে স্যার আনন্দের সঙ্গে সালমানকে মিষ্টিমুখ করান। ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পাওয়া নিয়ে তার উপলব্ধি হল, “ডাক্তার হওয়া শুধু ডিগ্রি না, একটা দায়িত্ব সমাজের জন্যে নিজের কাঁধে নেওয়া এবং সেটা শ্রম অর্থ ও ভাষা দিয়ে পূরণ করা।” ■

সেখ খাদেম আলি

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪৫০৬০

তাম্রলিপ্ত গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপিটাল

“আমার কাছে আল-আমীন মিশন এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা শুধু মেধাবী শিক্ষার্থী তৈরি করে না, বরং অসহায় ও আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ করে দেয়। আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান যে, এই প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্র হতে পেরেছি। আল-আমীন মিশন আমার কাছে শুধু



একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং আমার জীবনের একটি আশ্রয় ও আলোর পথ।”— হৃদয় থেকে উৎসারিত এই অভিব্যক্তি উচ্চারণ করেছে হুগলি জেলার গোঘাট থানার হাজিপুর গ্রামের তরুণ সেখ খাদেম আলি।

২০০৯ সালের এক ট্রেন-দুর্ঘটনায় মুহুর্তেই খাদেম আলির সবকিছুকেই ওলটপালট করে দেয়। ওই দুর্ঘটনায় তার আববা সেখ রফিক আলি ইন্তেকাল করেন। সে-সময় খাদেম প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র। তার দাদা সেখ সজ্জা আলি ও শিশু বোন বুকিয়া সেখও পিতৃহীন হয়ে পড়ে। নিরক্ষর মরহুম রফিক আলি কার্ঠমিস্ত্রি ছিলেন। তিন সন্তানের জননী বুপসানা বিবির চারিদিকে সে-সময় ছিল কেবলই শূন্যতা। শুরুর করেন লোকের বাড়িতে সামান্য কাজকর্ম থেকে রাজমিস্ত্রির জোগাড় দেওয়া পর্যন্ত সব ধরনের শ্রমের কাজ। প্রাইমারি পেরিয়ে হাজিপুর ইউনিয়ন হাই স্কুলে

ভর্তি হয় খাদেম। ২০১৭-তে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭২ শতাংশ নম্বর পেয়ে পরিবারের মুখে হাসি ফেটায়।

ভর্তির প্রস্তুতি আর্থিক বিষয়ে আশঙ্কিত হলেও মা ও ছেলে সত্যসরি খলতপুরে পৌঁছে যান। সেক্রেটারি স্যার খাদেম ও তার মাকে আশঙ্ক করে প্রায় শূন্য মাসিক বেতনে ভর্তি করে নেন। মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, ভালো করে পড়তে হবে। মাকে বলেন, “আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান।” বুপসানা বিবি খুশিতে ছলছল-চোখে ছেসেঁকে নিয়ে বাড়ি ফেরেন। মেদিনীপুর শাখা থেকে ৮২ শতাংশ নম্বর পেয়ে ২০১৯ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে খাদেম। রানিং ইন্টার্নশিপ নিট পরীক্ষায় বসে ২৯৫ নম্বর পেয়ে উজ্জীবিত হয়। শুরুর করে নিটের প্রভুতি মিশনের উলুবেড়িয়া শাখায়। ২০২০-তে পায় ৪০০ নম্বর। পরে খলিশানি শাখা থেকে ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে পায় যথাক্রমে ৪৫০, ৫১৯, ৫৭৯ নম্বর। ২০২৩-এ বি.ডি.এস.-এ ভর্তির সুযোগ এলেও ভর্তি হয়নি। ২০২৪-এ আরও ভালো ফল করে ৬২৮ নম্বর পায় এবং বর্তমান ডেন্টাল কলেজে ভর্তি হয়ে যার। খাদেম কিন্তু ততটা খুশি হতে পারেনি, সে কিছু দিন ক্লাস করে ডেন্টাল কলেজে থেকে আবার হাস্টেলে ফিরে এসে নিটের প্রভুতিতে ডুব দেয়। এভাবেই ২০২৫-এ ৪৯৮ নম্বর পেয়ে মাত্র কয়েক নম্বরের জন্যে এম.বি.বি.এস.-এ সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ২০২৬-এ নিট পরীক্ষার জন্যে প্রভুতিতে থাকলেও কেবলমাত্র নিট পরীক্ষা বাতিলের পর বি-নিট পরীক্ষা পর্যন্ত প্রায় এক মাস হাস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। রেজাল্ট বের হলে হাজিপুরের খাদেমের বাড়িতে জলে ওঠে খুশির রোশনাই। সবার খুশি-খুশি ভাব হলেও, বুপসানা বিবি কেবলই বিষম্বাতায় চোখের জল ফেলে চলেছেন। হাজিপুর গ্রামের প্রথম এম.বি.বি.এস. চিকিৎসক হতে যাচ্ছে পিতৃহীন সেখ খাদেম আলি। তার ইচ্ছে ভবিষ্যতে মেডিসিনে এম.ডি. করার।

খাদেমকে আল-আমীন কী জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর ছিল, “আল-আমীন মিশনে পড়াশোনা করতে এসে আমি শুধু বইয়ের সিলেবাসের শিক্ষা পাইনি, শৃঙ্খলা, আত্মবিশ্বাস ও মানুষের মতো মানুষ হওয়ার শিক্ষাও পেয়েছি।” ■

শেখ নওসিন শারমিলি

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক ৪৬০৯৬

রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতাল

কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তির সুযোগ না পেলেও নওসিনের দৃষ্টিতে ডা. নীলরতন সরকার (১৮৬১-১৯৪৩) অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ব্যক্তিত্ব। কারণ ডা. নীলরতন সরকার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগরে বসবাস করতেন এবং পড়াশোনা করেছেন বহু বয়েজ হাই



স্কুলে। নওসিনের বসতবাড়িও জয়নগর থানার অন্তর্গত বহুদিঘিবাড় থাম। সে মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন বহু গার্লস হাই স্কুলে। স্বভাবতই তাদের জনপদের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্যার নীলরতন সরকারের প্রতি তার বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালো লাগা। ২০২০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৮৪.৪২ শতাংশ নম্বর পায়ে নওসিন। এরপর একাদশ শ্রেণিতে সে ভর্তি হয় আল-আমীনের চাপড়া শাখায়। এই শাখা থেকেই ২০২২-এ উচ্চ-মাধ্যমিকের বিজ্ঞান বিভাগে তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৩৯।

প্রাথমিক মধ্যবিস্ত ও নিম্ন-মধ্যবিস্ত পরিবারের সন্তানেরা আল-আমীনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে আজকাল সর্বভারতীয় মেডিকেল প্রবেশিকা কোর্সের পরীক্ষা, অর্থাৎ নিট (ইউজি)-এ সাফল্যের স্বপ্ন নিভুতে দেখতে থাকে। নওসিনও সেসকলই একজন। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার সাজে ৩২। সাফল্যের আলোকবর্তিকা ২০২৬

২০২২ সালের নিট পরীক্ষায় নওসিন প্রায় ২০০ নম্বর পায়। এই নম্বরে নিবৃৎসহিত না হয়ে নিবিড় প্রত্নতি নিতে মনস্থ করে সে। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অধিক সংকট। নওসিনের আব্বা স্নাতক শেখ মহিউদ্দিন আহমেদ একটি বেসরকারি সংস্থায় সামান্য বেতনের কাজ করেন। সংসার পরিচালনা করেন মাধ্যমিক পাস নওসিনের মা সাহিদা বেগম। নওসিনের একমাত্র ভাই জুনাইদ আহমেদ স্থানীয় হাই স্কুলের ছাত্র।

নওসিন মিশন-কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় খুবই কম মাসিক বেতনে বাবুইপুর শাখায় নিটের নিবিড় প্রত্নতির জন্যে ভর্তি হয়। ২০২৩, ২০২৪ ও ২০২৫-এ যথাক্রমে ৩৯০, ৫৬০ ও ৪৪৭ নম্বর পেলেও সাফল্য রয়ে যায় অথবা। তবুও অদম্য নওসিনের মানসিকতা কোনোভাবেই ভেঙে পড়ে না। পরিশ্রম ও পরিকল্পনার অনবদ্য সৃজনশীল মিলনে নওসিন ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ও বায়োলজির এনসিইআরটির বই ও প্রশ্নোত্তরে নিজেকে নিমজ্জিত রাখে। অবশেষে ২০২৬-এ সাফল্য ধরা দেয় নওসিন শারমিলির। ৫৪০ নম্বর পেয়ে সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ক করে ৪৬০৯৬। আনন্দাশ্রুতে ডুবে যায় গোটা পরিবার। কারণ দিঘিবাড় থামের এম.বি.বি.এস. পড়তে সুযোগ পাওয়া প্রথম কন্যাই নওসিন। সত্যিই গৌরবের বিষয়।

নওসিন ও তাঁদের পরিবার জানায়, আল-আমীনে না এলে এই সাফল্য আসত না। নওসিন ভবিষ্যতে নিউবোলজি নিয়ে চিকিৎসাবিদ্যার উচ্চতর ডিগ্রি হাসিল করতে আশী। কারণ, তার আববাসহ প্রতিবেশীদের কেউ কেউ বর্তমানে স্নায়ুরোগে ভুগছেন। নওসিন জানায়, চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন আত্মা পূরণ করে দিয়েছেন। পেরে স্বপ্ন ভালো মানবিক চিকিৎসক হয়ে নিজপরিবার ও এলাকার মানসস্বান বৃদ্ধি করা। এ ছাড়া মরহুম দাদুর ইচ্ছার প্রতি সং থেকে অসুস্থ প্রাথমিক প্রতিবেশীদের সাধ্যমতো পরিষেবা প্রদান। নওসিনকে তার পিতা একজন ভারতীয়ব নাম জিজ্ঞেস করলে মুহূর্তেই বলে ওঠে, আনন্দীবাঈ গোপালবাও জোশী (১৮৬৫-১৮৮৭)। কারণ, তিনি বিদেশি সনদপ্রাপ্ত ভারতের প্রথম নারী চিকিৎসক। ■

উচ্চ-মাধ্যমিক ২০২৬-এ সফল পড়ুয়াদের

হার্দিক অভিনন্দন

11th



486 (97.2%)

Sk Md Talha Atique

Board	পরীক্ষার্থী		৯০%	৮৫%	৮০%	৭০%	দুঃস্থ ও নিম্নবিত্ত	৪২৮ জন (২৩%)
WBCHSE	ছাত্র-ছাত্রী	১৭২২	৩৩২	৮৪৯	১৩৭৫	১৭০৮	নিম্ন-মধ্যবিত্ত	৫৮৪ জন (৩১%)
CBSE	ছাত্র-ছাত্রী	১৭৩	৩	১৫	৪০	১০৭		
	সর্বমোট	১৮৯৫	৩৩৫	৮৬৪	১৪১৫	১৮১৫	মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত	৮৮৩ জন (৪৬%)

12th



485 (97%)
Alfaj Alam

13th



484 (96.8%)
Sk Oliullah

14th



483 (96.6%)
Asikul Ali

14th



483 (96.6%)
Idrish Khan

15th



482 (96.4%)
Md Mukhtar Nabil

16th



481 (96.2%)
Abdul Jaid Sk

18th



479 (95.8%)
Aminul Islam

18th



479 (95.8%)
Mahammed Tanbir

18th



479 (95.8%)
Saikat Shaikh

19th



478 (95.6%)
Momtajul Hasan Sk

19th



478 (95.6%)
Sk Jahid Mahmood

20th



477 (95.4%)
Ajfar Mollick

20th



477 (95.4%)
Mizanoor Rahaman

20th

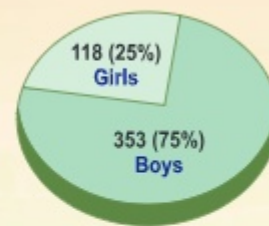
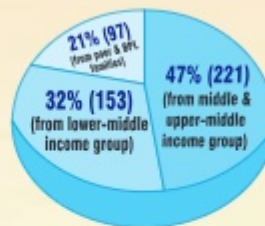


477 (95.4%)
Sk Jakariya



NEET (UG) 2026

Sustained Excellence



Marks 600 & above
Within AIR 10136

27

Marks 570 & above
Within AIR 23559

138

Marks 550 & above
Within AIR 37512

260

Marks 530 & above
Within AIR 55866

423

Marks 525 & above
Within AIR 60933

471

Marks 645
AIR 1805



Mosiur Rahman

Marks 641
AIR 2147



Mudassirul Islam

Marks 632
AIR 3248



Nafisa Parveen

Marks 630
AIR 3498



Sakil Dafadar

Marks 624
AIR 4408



Masum Ikbal

Marks 624
AIR 4412



Nawaz Muntasir

Marks 623
AIR 4544



Mahmudur Rahman

Marks 621
AIR 4967



Mansur Alam

Marks 619
AIR 5314



Afjal Hossain

Marks 617
AIR 5704



Farhana Siddiqua

Marks 615
AIR 6092



Sayed M Rahman

Marks 615
AIR 6142



Sk Jahid Mahmood

Marks 612
AIR 6768



Abdul Jaid Sk

Marks 612
AIR 6845



Sain Aktar

Marks 611
AIR 6878



Masud Rana Sk

Marks 611
AIR 7009



Md Masedul Hossain

Marks 610
AIR 7236



Abu Sabeet Ahmed

Marks 610
AIR 7334



Kifayat Chowdhury

Marks 607
AIR 7955



Sk Ataul Rahman

Marks 607
AIR 8032



Imran Ali

Marks 606
AIR 8143



Jasmin Pervin

Marks 606
AIR 8287



Raisa Parvin

Marks 605
AIR 8490



Nasiba Khatun

Marks 603
AIR 9115



Sabdar Ali

Marks 602
AIR 9422



Ramiz Raja Mallick

Marks 601
AIR 9760



Mejanur Rahman

Marks 600
AIR 10136



Sahina Khatun